স্বদেশ আমার
ইংরেজ ভারত ছাড়ো

স্বদেশ আমার

4'6

৮৯৯

শ্রীমণীশরঞ্জন ঘোষ এম-এ.
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিজ্ঞ শিক্ষক
দমদম্ কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমী

গ্রন্থলোক
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
এম, টি ৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০৭

॥ ভূমিকা ॥

বিরাট দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এই দেশেরই একটি কীর্তিমুখর গৌরবময় অংশ হলো বাংলা। এই বাংলাকে নিয়েও সারাদেশের গৌরব বড় কম নয়। দেশের মুক্তি-আন্দোলনে বাংলার বীর সন্তানরা যে-উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা সমগ্র দেশের ও জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই পুস্তিকায় তাই শুধু বাংলার দামাল সন্তানদের আগ্নেয় ভূমিকার চিত্রটিই তুলে ধরা হয়েছে। আর একটি উদ্দেশ্যও আছে। পঞ্চম শ্রেণীর শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের কাছাকাছি দেশ-পরিমণ্ডলের ইতিহাস স্রষ্টাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো সেই উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা গোটা দেশের আন্দোলনের চিত্রটিকে তাদের মতো করে বুঝি নিতে পারবে বলে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এ-বিষয়ে যদি নতুন কোনো আলোকপাত করতে পারেন, তাহলে আমরা বিশেষ উপকৃত হবো।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মৃত্যুঞ্জয়ী বীর

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী বীর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—প্রাণ দিয়েছিল হাসতে হাসতে। এদের আমরা ভুলতে পারি না। তবু এর মধ্যে এমন কয়েকটি নাম আছে যেগুলি আমাদের মনের পটে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। ঐ নামগুলির একটি হলো প্রফুল্ল চাকী, অন্যটি ক্ষুদিরাম।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। তখন সারা বাংলা জুড়ে চলছে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলন। এই আন্দোলনে বাংলা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়ে উত্তাল। দিনের পর দিন শাসক ইংরেজ ভারতীয়দের উপর অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। এই অত্যাচার এক সময় সহ্যের সীমা গেল ছাড়িয়ে। তখনই দেশের বীর বিপ্লবীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রামে নেমে গেল।

অত্যাচারী ইংরেজের এই অত্যাচার চালাবার মূলে ছিলেন কিংসফোর্ড। ঐ সময়ে তিনি ছিলেন চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্। তাঁর অত্যাচার বাংলার বিপ্লবীদের ক্ষেপিয়ে তুলল। এই অত্যাচার যখন চলছে তখন একদিন বালক সুশীলকুমার সেন ইংরেজ সার্জেন্টকে জনতার উপর অত্যাচার চালাতে নিষেধ করলেন। ইংরেজ সার্জেন্ট তাতে ক্ষেপে গিয়ে বালক সুশীলকে

মারতে লাগল। বালক হলে কী হবে সেও কম নয়। বাংলার বীর ছেলে সুশীল সঙ্গে সঙ্গে সেই ইংরেজ সার্জেন্টের উপর ঘুষি চালিয়ে দিল। সার্জেন্টটি রিভলবার বের তাকে ধরে নিয়ে গেল কিংসফোর্ডের সামনে। কিংসফোর্ড প্রকাশ্য আদালতে সুশীলকে বেত মারবার আদেশ দিলেন। হাত-পা বেঁধে তাকে এমন বেত মারা হল যে, তার গা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সুশীল সে আঘাত সইতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। যারা এই দৃশ্য চোখে দেখলো, তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, যে করেই হোক এই সাহেবকে সরাতেই হবে। হ্যাঁ' প্রয়োজন হলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বহু বিপ্লবী একত্র হলো শ্রীঅরবিন্দের অধীনে। প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো প্রস্তুতি। এর মধ্যে অবস্থা আন্দাজ করে কিংসফোর্ড কলকাতায় থাকাটা আর নিরাপদ বলে মনে করলেন না। তিনি চলে গেলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে মুজফ্ফরপুরে। কিন্তু বিপ্লবীর দল তাতেও দমবার পাত্র নয়। কিংসফোর্ডকে শাস্তি দেবার প্রতিজ্ঞা থেকে তাঁরা একটু নড়লেন না। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য মেদিনীপুর থেকে বিপ্লবী হেমচন্দ্র পাঠালেন ক্ষুদিরাম বসুকে আর শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ পাঠালেন প্রফুল্ল চাকীকে। ঠিক হলো, এরা দুজনে মুজফ্ফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে হত্যা করবে। এদের হাতে দেওয়া হলো দুটি রিভলবার। উল্লাসকর দত্ত নামে একজন বিপ্লবী কাঠের হাতলওয়ালা বোমা ছুঁড়বার কায়দা এদের শিখিয়ে দিলেন। ওরাও গোপনে গোপনে অনেক অভ্যাস করে তৈরী হয়ে নিল। এরপর ওরা মরণ পণ করে যাত্রা করলো মুজফ্ফরপুরের দিকে। ঠিক হলো, যদি ধরা পড়বার মতো অবস্থা হয় তাহলে ওরা আত্মহত্যা করবে। রিভলবার দুটি ঐজন্যই নেওয়া।

অনেক পরিশ্রমের পর অনেকের চোখ এড়িয়ে ওরা এসে পৌছাল মুজফ্ফরপুরে। কাজটি খুবই কঠিন। তাই এর জন্য বেশ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। বিপ্লবী নেতারা এইজন্য ওদের আসল নাম দিলেন বদলে। প্রফুল্ল চাকীর নাম হলো দীনেশচন্দ্র রায় আর ক্ষুদিরামের দুর্গাদাস সেন। ভুল করে যদি একজন অন্য জনের আসল নাম ধরে ডেকে ফেলে, সেইজন্য এদের কাউকেই অন্য জনের নাম জানতে দেওয়া হয়নি। এইভাবেই ওরা মুজফ্ফরপুর গিয়ে একটি ধরমশালায় উঠল। কারণ ওখানে কিছুদিন থেকে ওখানকার পথ-ঘাট ভালো করে চিনে নিতে হবে। কিংসফোর্ডের বাড়ী এবং সেখানে পথও ভালো করে চিনতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে কোথায় এবং কোন্ সময়ে তাদের আসল কাজটি সারতে হবে।

কিংসফোর্ডের বাড়ীটি ছিল মুজফ্ফরপুরের ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছেই। কিংসফোর্ড রোজই সন্ধ্যাবেলায় ঐ ক্লাবে যেতেন আর ফিরতেন অনেক রাতে। কিংসফোর্ড এই যাওয়া-

আসার কাজটি সারতেন ঘোড়ার গাড়ীতেই। ওরা দুজন আসল কাজে নামার আগে এ-সব খোঁজ-খবর ভালো করেই নিয়েছেন। কিন্তু এরা যত গোপনেই এসব কাজ করুক না কেন, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ এদের এই পরিকল্পনার সবটা না হলেও কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। কিংসফোর্ডকে যে বোমার সাহায্যে মারবার চেষ্টা চলছে, এ-কথা পুলিশ তাঁকে জানিয়ে দিল।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত। এই অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল ইউরোপীয়ান ক্লাবের গেটের কাছে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। রাত ঠিক আটটা। কিংসফোর্ডের ঘোড়ার গাড়ীটি বেরিয়ে এল ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে। ঐ গাড়ীতেই রোজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে যাওয়া-আসা করেন কিংসফোর্ড। গাড়ীটাকে আসতে দেখেই ওরা ঠিক লক্ষ্যে বোমটি ছুঁড়ে দিলো। প্রচণ্ড আওয়াজ করে বোমাটা ফাটল আর গাড়ীটা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আর্ত চিৎকারে জায়গাটা ভরে উঠল। কিন্তু হায়! এ কী হলো। ঐ গাড়ীতে যে ঐ দিন কিংসফোর্ড আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন না। ছিলেন অন্য এক সাহেবের স্ত্রী আর কন্যা। সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়লো ওঁরাই।

এদিকে বোমা ছুঁড়েই প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম রেললাইন ধরে সমস্তিপুরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। এক রাতের মধ্যেই ওরা প্রায় তেইশ-চব্বিশ মাইল পার হয়ে গেল। ওরা তো এগিয়ে চললো, কিন্তু পুলিশও চুপচাপ বসে থাকেনি। হত্যাকাণ্ডের কথা চারদিকে প্রচার করে দিলো আর প্রতিটি রেল স্টেশনে টেলিগ্রাম করে আততায়ীদের ধরবার জন্য নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হলো। ওসব খবর প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরামের কানেও গেলো। পুলিশের ছড়ানো জালে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ওদের মনে দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে তুলল। সেই সঙ্গে ক্ষিদে, তেষ্টা আর পথ চলার পরিশ্রম ওদের প্রায় বিকল করে তুললো। সেই সময় সমস্তিপুরের কাছাকাছি গিয়ে একটা দোকান থেকে মুড়ি কিনতে গিয়ে ধরা পড়লো ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল সেখান থেকে কোনো রকমে পালিয়ে গেল। পুলিশ সমানে তাকে খুঁজে চলেছে। এমন অবস্থাতেও সমস্তিপুরের এক বাঙালী ভদ্রলোক তাকে আশ্রয় দিলেন। সেখান থেকে বেশবাস পালটে প্রফুল্ল কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলো।

ট্রেনের কামরার এক কোণে চুপচাপ বসেছিল প্রফুল্ল। প্রফুল্লর ভাগ্য এমনি মন্দ যে, সেই কামরাতেই উঠে পড়লো পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্লর নতুন জামা কাপড় দেখে নন্দলালের সন্দেহ হলো। সেই সন্দেহের বশে নন্দলাল প্রফুল্লকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো। প্রফুল্ল বিপদ বুঝে পরের স্টেশনেই গাড়ীর কামরা বদল করে। তাতে নন্দলালের সন্দেহ আরও বাড়ে। আর তখন নন্দলাল মোকামার পুলিশ কর্তার অনুমতি

নিয়ে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করবার উদ্যোগ নেয়। প্রফুল্ল সমস্ত বুঝতে পেরে গুলি চালায়, কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে যায় নন্দলাল।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে পুলিশবাহিনী প্রফুল্লকে ঘিরে ধরেছে। পালাবার কোনো উপায় নেই। ধরা দেওয়া অথবা মৃত্যুবরণ—যে-কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে বীর সংগ্রামী প্রফুল্ল কিন্তু বেছে নিলো মৃত্যুকেই। বুকে আর মাথায় নিজেই পর-পর দুটি গুলি করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। বাংলার বীর সন্তান দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিলো।

গৌরবময় মৃত্যুবরণ করে অমর শহীদ হলো প্রফুল্ল। কিন্তু ক্ষুদিরাম তখনও বেঁচে। নরহত্যার অভিযোগ আনা হলো তার বিরুদ্ধে। মুজফ্‌ফরপুর কোর্টে শুরু হলো বিচার।
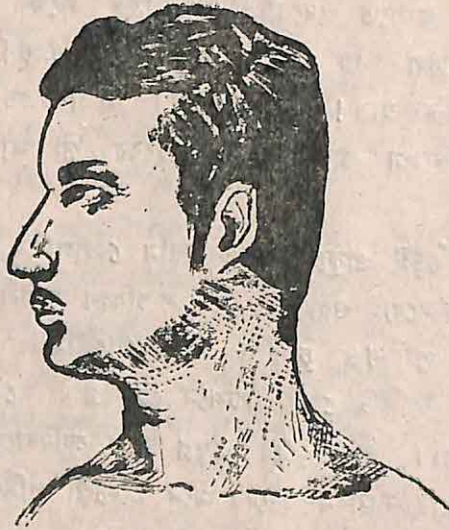
এই বিচারের খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। লোকের ভীড়ে উপচে পড়লো আদালত-প্রাঙ্গণ। অগুনতি জেরার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো সময়েই মিথ্যার আশ্রয় নিলো না ক্ষুদিরাম। নির্ভীক চিত্তে, অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করে নিলো সমস্ত অভিযোগ। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টাই এক মুহূর্তের জন্যও করলো না সে। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো। হাইকোর্টও এই আদেশ অনুমোদন করলো।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট। ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরনীয় দিন। ঐ দিনটিতেই ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। গান গাইতে গাইতে পরিচিত মানুষদের দিকে চেয়ে মৃদুমধুর হাসি ছড়াতে ছড়াতে তার এগিয়ে যাওয়া উপস্থিত

মানুষদের মধ্যে যেমন সঞ্চার করলো বেদনার, তেমনি উদ্দীপনার। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের গৌরব সকলের অন্তরকে তুললো জাগিয়ে। মৃত্যুভয় যে কিছু নয়, একথাটাও কত সহজে সে জানিয়ে গেল দেশবাসীকে।

আজও বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-শহরকে একইভাবে মাতিয়ে তোলে সেই গান—"একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।" আর এই গানের মধ্য দিয়েই আমরা শুনতে পাই ক্ষুদিরামের অমর আত্মার গুঞ্জন ধ্বনি।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল কেন? ছদ্মবেশী হিসাবে তাদের নাম কী ছিল?

২। কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতা থেকে কোথায় কেন বদলি হয়েছিলেন? সেখানে তিনি কোথায় থাকতেন?

৩। কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীরা হত্যা করতে চেয়েছিল কেন? তারা এই হত্যার জন্য কিভাবে নিজেদের তৈরী করেছিল?

৪। কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে কখন কোন্ জায়গা থেকে কারা বোমা ছুঁড়েছিল? এর পরিণাম কী হয়েছিল?

৫। কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়বার পর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কোন্ দিকে ছুটে যাচ্ছিল? ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল কিভাবে?

৬। প্রফুল্ল চাকীর পুলিশের কবলে পড়া ও মৃত্যুবরণের বর্ণনা দাও?

৭। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কেন?

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ

জন্ম ঃ ১৫ই আগষ্ট, ১৮৭২ মৃত্যু ঃ ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০

ঋষি অরবিন্দ। পরবর্তীকালে ঋষি বলে পরিচিত হলেও ভারতজননীর সুসন্তান হিসেবে তাঁর জীবন তিনি শুরু করেছিলেন বিপ্লবের চিন্তায় মন-প্রাণ ভরে।

সিভিল সার্জেন কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন অরবিন্দের পিতা। প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন তিনি, তার উপর মনে-প্রাণে ছিলেন দস্তুর মতো একজন সাহেব। তাই তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেকেও এমনি একজন পাকাপোক্ত সাহেব করে তুলতে। সেই অনুযায়ী চেষ্টাও শুরু করেছিলেন। অরবিন্দকে একেবারে ছোটবেলাতেই তিনি ভর্তি করে দিলেন দার্জিলিং-এর এক সাহেবী স্কুলে। অরবিন্দের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। এর দু'বছর পরেই কৃষ্ণধন অরবিন্দকে তাঁর বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেজিয়ারের আত্মীয় অক্রয়েড সাহেবের কাছে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অক্রয়েড পরিবারের আন্তরিক ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজেকে সেই পরিবারেরই একজন বলে ভাবতে লাগলেন। এরকম ভাবতে ভাবতে একসময় তিনি নিজেকে অক্রয়েড এ· ঘোষ নামে পরিচিত করিয়ে তৃপ্তি পেতেন।

ছাত্র হিসেবে অরবিন্দ ছিলেন খুবই মেধাবী। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মেধার পরিচয় প্রকাশ পেল। তাতে সবাই যেমন মুগ্ধ হলেন, তেমনি হলেন আনন্দিত। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য বিষয়ে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার শেষ অংশ ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় এই পরীক্ষায় পূর্ণ সফলতা তিনি পাননি। এদিকে তাঁর পিতাও তখন অমিতব্যয়িতার জন্যে শেষ বয়সে বড় অর্থকষ্টে পড়েন। এর ফলে অরবিন্দকে বিদেশে বেশ কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। বরোদার মহারাজা এই সময় বিলেতে ছিলেন। বাবা নিয়মিত টাকা পাঠাতে না পারায় অরবিন্দের কষ্টের কথা ভেবে এবং অরবিন্দের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে তাঁর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে চাকরী দেন।

ছাত্রজীবনেই অরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ভাষায় ক্রমে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর দক্ষতা খোদ ইংরেজ সমালোচকদেরও শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করল। ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করে সেই সময়কার ইংরেজ কবিদের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করলেন। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই ইংলণ্ডে পড়াশুনা করায় অরবিন্দের বিদ্যাচর্চা মূলতঃ ইংরেজী ভাষাতেই

হয়েছিল। ফলে মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই গড়ে উঠেনি। ইংলণ্ডে আসার আগে মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর যেটুকু পরিচয় ছিল, তাও এর মধ্যে ভুলে গেলেন। তাই দেশে ফিরে প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে আয়ত্তে এনে সংস্কৃত শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ পড়তে শুরু করলেন। এই সব পড়ার ফলে তিনি মনের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন অনুভব করলেন। এরপর তিনি মাতৃভাষা শেখার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। সুলেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে বেশ ভালো করে বাংলা শিখলেন। বাংলা ভাষা আয়ত্তে এনে তারপর বাংলা সাহিত্যপাঠে মনোনিবেশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বইগুলো একে একে পড়লেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'আনন্দমঠ' উপন্যাস একদিকে যেমন তাঁর মনে পরাধীনতার বেদনা সঞ্চার করলো, অন্যদিকে তেমনি তাঁর মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুললো। তখন থেকেই তিনি দেশকে বিদেশী-শাসনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে বরোদায় থাকার সময়েই অরবিন্দ মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লবী নেতা পুণার ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই চলে সক্রিয় বিপ্লবের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি-পর্বে তাঁর সাহায্য নিয়েই বাঙালী বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সামরিক শিক্ষালাভের জন্যে যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম নিয়ে গায়কোয়াড় সৈন্য-দলে ভর্তি হয়েছিলেন। এইভাবে পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত করেও তিনি এই বিপ্লব-অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন। এই সময় বাংলা থেকেও বিপ্লবকে সংগঠিত করে তুলে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এইজন্যে তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই ভাই বারীন্দ্রকুমারকে বাংলায় পাঠালেন। এর কয়েক বছর পরেই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় শুরু হলো ব্যাপক স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্যে অরবিন্দ বরোদার ভাল চাকরী ছেড়ে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় চলে এলেন। সেই সময় বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যে-কলেজটি মাত্র স্থাপন করেছিল, তিনি সেই কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময়েই তিনি আবার 'বন্দেমাতরম্' নামে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকাটি পরিচালনা করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি দেশের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা বিরাট অলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই অরবিন্দ বিপ্লবের কাজে আরো অনেক সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন।

বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে ঐ বছরেরই মে মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। তারপর প্রায় এক বছর ধরে চলে মামলা। এই মামলা আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত। এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেছিলেন, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা কোনো অবস্থাতেই কারো অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারকে তখন সত্য-সত্যই রাজদ্রোহিতা বলে মনে করা হতো। অরবিন্দের সত্য বাক্য উচ্চারণ এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাল। বিপ্লবীরা নতুন বল ও পথের সন্ধান পেলো। রাজদ্রোহিতাকেই তারা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলো।

আলিপুর বোমার মামলা চলার সময় অরবিন্দ জেলখানার নয় ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া একটা ঘরে বন্দী ছিলেন। সেই ছোট ঘরটির কোনো জানালা ছিল না আর ঘরটিতে দরকারী কোনো আসবাবও ছিল না। ঐ সময়ে জেলের কুঠুরিতে অরবিন্দকে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়েছে। বর্ষায় সেই ঘরে অবাধে জল ঢুকতো, গরমে ছোট ঘরটি উঠতো তেতে আবার শীতে যেতো জমে। শীতে জেলেরই তৈরি একখানি মোটা কম্বলই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

জেলখানার চরম কষ্টকর অবস্থাকে সহনীয় করে তুলবার জন্যে অরবিন্দ নিজের মনকে অন্য পথে চালিত করতে লাগলেন। সে পথ যোগ সাধনার। দিনের অধিকাংশ সময় এই যোগ সাধনাতেই মগ্ন থাকতেন তিনি। জেলের ছোট্ট নিশ্ছিদ্র ঘরটিতে বাস করতে করতে এইভাবেই তিনি একদিন জীবনের পরম মুহূর্তের ও পথের সন্ধান পেলেন। অন্তরের গভীরে অনুভব করলেন দিব্য জীবনের মহামন্ত্রকে—জীবনের মহাসত্যকে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ জাতীয়তা ও ভারত-সাধনা প্রসঙ্গে নিয়মিতভাবে লিখতে লাগলেন। এর মধ্যেই একদিন ভগিনী নিবেদিতা খবর দেন দেন যে, ইংরেজ সরকার তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এই খবর পেয়েই মাত্র দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে চলে যান। তারপর সেখান থেকেই ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে চলে যান। সেখানেই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে ইহজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যোগ-সাধনায় মগ্ন থাকেন। কিছুদিন পর অন্তরের নির্দেশ পেয়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করে যোগ-সাধনায় মগ্ন হন। এর পর তাঁর কাছে ফ্রান্স থেকে আসেন মাদাম পল রিশার। এই মাদাম পল রিশারই পরবর্তী কালে হয়ে উঠেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শ্রীমা।

যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবার সময় দিব্য জীবন প্রসঙ্গে অনেক লেখা লিখেছেন। এই সমস্ত লেখা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'আর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য অরবিন্দের প্রায় সব রচনাই ইংরাজীতে লেখা। এই রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'The Life Divine' এ বইয়ে অরবিন্দ দিব্য জীবন-সাধনার বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এ বইটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বইগুলির মধ্যে একটি। পুরাণের সাবিত্রীর

কাহিনী অবলম্বন করে এরপর অরবিন্দ 'Savitri' নামে একটি অপরূপ কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর মহান জীবন-সাধক অরবিন্দ তাঁর ইহলোকের লীলা সংবরণ করেন।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। অরবিন্দকে তাঁর পিতা কিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন? ঐ উদ্দেশ্যে তিনি কী করেছিলেন?

২। ছাত্র হিসাবে অরবিন্দ কেমন ছিলেন? কত বছর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন? এর ফল কী হয়েছিল?

৩। ইংলণ্ডে থাকাকালে অরবিন্দ কিরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন? এই অসুবিধাগুলি দূর করতে তখন কে এগিয়ে এসেছিলেন? তিনি এ ব্যাপারে কিভাবে কতটুকু সাহায্য করতে পেরেছিলেন?

৪। অরবিন্দ ইংলণ্ডে থাকাকালে কোন্ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? তিনি দেশে ফিরে সংস্কৃত ভাষা শিখে কী ফল পেয়েছিলেন? বাংলা ভাষা তিনি কিভাবে শিখেছিলেন এবং ফল কী হয়েছিল?

৫। অরবিন্দ বিপ্লবের পথে কিভাবে কতটুকু এগিয়েছিলেন?

৬। অরবিন্দ জেলখানায় কী রকম ঘরে কিভাবে কাটিয়েছিলেন? এভাবে কাটাবার ফলে তাঁর মনের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল?

৭। জীবনের কোন্ অবস্থায় এসে অরবিন্দ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করেন? তারপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন কিভাবে কাটে? তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাটির নাম উল্লেখ কর।

———

'বাঘা' বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ

জন্ম ঃ ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ মৃত্যু ঃ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Morning shows the day. মানুষ সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। বড় হয়ে কে কী হবেন, তার ইঙ্গিত ছোটবেলাতেই পাওয়া যায়। শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলাও তারই ইঙ্গিত দেয়।

যতীন্দ্রনাথ তখন কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ছাত্র। ঐ স্কুলের একটি বাগান ছিল। সেই

বাগানে অনেক ফলের গাছ ছিল। একবার আম কাঁঠালের সময় ঐ বাগানে কাঁঠাল চুরি যায়। স্কুলের ভীষণ রাগী হেডমাস্টার মশাই যতীন্দ্রনাথদের ক্লাসে এসে জানতে চান—"স্কুলের বাগানের কাঁঠাল গাছ থেকে কাল কাঁঠাল চুরি গেছে। আমি জেনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ বা কয়েকজন এই কাঁঠাল চুরি করে খেয়েছ। যে বা যারা এ কাজ করেছ, উঠে দাঁড়াও।"

হেড মাস্টার মশাইয়ের কঠিন মূর্তি দেখে ছেলেরা তো ভয়ে কাঁপছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বারো বছরের বালক যতীন্দ্রনাথই শুধু উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন—"এ কাজ আমিই করেছি স্যার।"

হেড মাস্টার মশাই অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন, পড়াশুনা খেলাধুলা সবকিছুতেই স্কুলের সেরা ছেলে এই কাজ করেছে। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। মনের মধ্যে কেমন যেন একটু দুর্বলতাও বোধ করছেন। তবু শাসন তাঁকে করতেই হবে। তিনি যে হেডমাস্টার। তাই তিনি বললেন—"ছিঃ ছিঃ তুমি এ কাজ করেছ। তোমার লজ্জা করছেনা।"

যতীন্দ্রনাথ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন—"না স্যার, আমার লজ্জা করছেনা। স্কুলের বাগানে কাঁঠাল দেখে আমাদের ক্লাসের সব ছেলের মনেই কাঁঠাল খাবার সাধ হয়েছিল। তাই জেনে আমি ওদের স্কুলের পর অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম স্কুলের বাগান তো আমাদেরই বাগান। তাই স্কুলের বাগান থেকে কাঁঠাল নিয়ে খাওয়া তো অন্যায় নয়। এই ভেবে আমিই কাঁঠাল পেড়ে ওদের খাইয়ে আনন্দ পেয়েছি। ওর জন্যে আমার লজ্জা বা দুঃখ কোনোটাই বোধ হচ্ছে না। তবু আপনি যদি এর জন্যে শাস্তি দিতে চান, আমি তার জন্যে তৈরি আছি।"

যতীন্দ্রনাথের পরোপকার বৃত্তি আর সত্যবাদিতার কথা হেডমাস্টার মশাইয়ের কানে আগেই এসেছিল। এবার তিনি নিজেই তার পরিচয় পেলেন। হাতের বেত নামিয়ে যতীন্দ্রনাথকে বসতে বলে তিনি চলে গেলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম উমেশচন্দ্র। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এক তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তিনি। যতীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তখন তাঁর মৃত্যু হয়। যতীন্দ্রনাথের মায়ের নাম ছিল শরৎশশী দেবী। তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পী। তাঁর স্নেহে-যত্নেই গড়ে উঠে যতীন্দ্রনাথের জীবন।

সংগ্রামী যতীন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রামের প্রথম পাঠ শুরু হয় তাঁর মায়ের কাছেই। সারাদিনের কাজ শেষ করে যতীন্দ্রনাথকে মা নিয়ে যেতেন নদীতে সাঁতার শেখাতে। শাড়ীর এক প্রান্ত দিয়ে বেঁধে যতীন্দ্রনাথকে ছুঁড়ে দিতেন নদীর স্রোতের মধ্যে। সাঁতার কেটে কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে তুলে নিতেন কোলে। এরপর একে একে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি, তরোয়াল চালনা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি বীরত্বপূর্ণ খেলায় যতীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হতে লাগল। এইভাবেই তিনি নিজেকে ছোটবেলা থেকেই দেহে ও মনে সবল করে গড়ে তুলছিলেন। তারপর তাঁর মামার বাড়ীতে ফেরাজ মিঞা নামে এক আফ্রিদি ওস্তাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। তার মুখে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের স্বাধীন লোকদের নানা কাহিনী শুনে যতীন্দ্রনাথের মনে স্বাধীনতার জন্যে আকুলতা জেগে উঠে।

যতীন্দ্রনাথের বয়স তখন পনেরো। একদিন কৃষ্ণনগরের বাজারে কাগজ পেন্সিল কিনতে

গিয়ে হঠাৎ তীব্র কোলাহলের মধ্যে শুনতে পেলেন—'হায় হায়' 'গেল গেল' রব আর শুনতে পেলেন—পালাও পালাও। পালাচ্ছেও সবাই। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ পালিয়ে গেলেন না। আসলে কী ঘটছে তা জানবার জন্যে রাস্তায় নেমে এলেন। দেখলেন ধুলো উড়িয়ে একটা পাগলা ঘোড়া ছুটে আসছে আর রাস্তার মাঝখানে একটা ছোট বাচ্চা আছে দাঁড়িয়ে। আর কিছু না ভেবে যতীন্দ্রনাথ ঘোড়াটা নাগালের মধ্যে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। হঠাৎ আক্রমণে ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াতেই যতীন্দ্রনাথ ঘোড়ার কেশর চেপে ধরলেন। তারপর একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। এই ফাঁকে আশপাশের লোকেরা বাচ্চাটাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিল।

এরপর কলেজে পড়বার জন্যে তিনি গেলেন কলকাতায়। তাঁর ঐ কলেজে পড়ার সময়েই কলকাতায় প্লেগ মহামারী লাগল। ঐ সময় দুর্গতদের সেবার জন্যে ভগিনী নিবেদিতার পাশে যে-সব তরুণ কর্মী এসে দাঁড়িয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই একজন। এই সেবার কাজে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রীতিমত একজন খুদে দলনায়ক। তা নিবেদিতার চোখ এড়িয়ে যায়নি। যতীন্দ্রনাথের কোমলে কঠোরে মেশা আচার আচরণ, তেজোদীপ্ত রূপ সহজেই আকর্ষণ করলো নিবেদিতাকে। নিবেদিতা একদিন যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই তিনি প্রথম জানতে পারলেন এবং জেনে উপলব্ধি করলেন, স্বাধীন না হলে ভারতের সাধনার কথা, ধর্ম ও দর্শনের বাণী জগতের কেউ কানে তুলবে না। ভারত ও ভারতবাসী তার উচিত মর্যাদা পাবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের ঐ সমস্ত কথায় যতীন্দ্রনাথ যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন সমস্ত কিছু ছেড়ে এখন দেশ ও দেশবাসীর সামনে একমাত্র লক্ষ্য হলো, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিলাভ।

যতীন্দ্রনাথ সেই মুক্তিলাভের পথটিকেই একাগ্রচিত্তে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঠিক সেই সময়েই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে শ্রীঅরবিন্দের। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদায় চাকরীরত। চাকরীকে সামনে রেখে তিনি আসলে পশ্চিম ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত করে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের জন্য বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। সেই আন্দোলনের উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ। ওখানে গিয়েই বলতে গেলে তিনি শ্রীঅরবিন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন বিপ্লববাদে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রমুখ নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। তখন আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হলো যতীন্দ্রনাথকে। তাঁর নেতৃত্বে যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে সরকারী উকিল আশু বিশ্বাস ও পুলিশ ডেপুটি সুপার সামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটো ঘটনা না ঘটলে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য

অনেক নেতাকে কারারুদ্ধ হতে হতো। তবে এই হত্যার ঘটনায় ধরা পড়ে চারু বসু ও বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের ফাঁসি হলো।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবলে পড়েছে তখন বিপ্লবীরা কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক-ব্যবসায়-সংস্থা 'রডা' থেকে অনেক জার্মান পিস্তল লুঠ করে নেয়। এই পিস্তলগুলো ওঁদের খুব কাজে লাগে।

বিপ্লবের এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তলায় এক গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুও কাশী থেকে এসে এই বৈঠকে যোগ দেন। দুজনে পরামর্শ করে জাঠ ও শিখ সেনাবাহিনীকে বশে আনার পরিকল্পনা করেন। সেইমত কাজও এগিয়ে চললো। সেনাধ্যক্ষ মনসা সিং-এর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়মের সৈন্যরা বিপ্লবীদের পতাকা হাতে নিয়ে সংকেত পেয়ে বেরিয়ে আসবে বলে কথা হল। যুদ্ধের জন্য ইংরেজ সৈন্যরা তখন দেশের বাইরে। এই সুযোগে দেশীয় সৈন্যরা সারা ভারতে বিদ্রোহকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এর মধ্যে জার্মান জাহাজে করে অস্ত্র-শস্ত্রও এসে পড়বে। এই রকম পরিস্থিতিতে বিদ্রোহকে সামাল দেওয়া ইংরেজের পক্ষে হবে অসম্ভব আর ভারতের স্বাধীনতালাভের পথও হবে সুগম।

গদর দলের নেতা সত্যেন সেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পথে জার্মানী থেকে অস্ত্র আসার পাকা খবর নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে চীন ও জাপানের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশ্বাসের কথাও বয়ে নিয়ে এলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র বিপ্লব অভিযানের দিন স্থির হয়। কিন্তু অর্থলোভী কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় এই ভারতজোড়া অভিযানটি ব্যর্থ হয়। এই কৃপাল সিং রাসবিহারী, কর্তার সিং ও পিংলেকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রাসবিহারী জাপানে গিয়ে আত্মগোপন করেন। কর্তার সিং ও পিংলে ধরা পড়েন ও পরে তাঁদের ফাঁসি হয়।

এদিকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে যতীন্দ্রনাথকে ধরবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। যে করেই হোক যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না।

এর মধ্যে খবর এল, তিনটি জার্মান জাহাজ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী অস্ত্রবোঝাই হয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো পৌছে যাবে ভারতে। প্রথমটি আসবে হাতিয়া বা নোয়াখালিতে, দ্বিতীয়টি সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে। ঠিক হল, সুন্দরবন থেকে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীরা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আক্রমণ করবে। আর তৃতীয় জাহাজটি উড়িষ্যার বালেশ্বরে এলে যতীন্দ্রনাথ সেখানে অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে নেবেন। তাই কয়েকজন অনুগামী নিয়ে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে এবং কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করতে উড়িষ্যায় চলে গেলেন।

সমস্ত বিপ্লবী বিপ্লবের জন্য মনের দিক্ থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। রক্ত তাঁদের টগবগ করছে বিপ্লবের উন্মাদনায়। ঠিক সেই সময় দুঃসংবাদ এলো, ইংরেজ বিপ্লবীদের সমস্ত গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলেছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথ খবর পেলেন যে ইংরেজ পুলিশ তাঁকে অনুসরণ করছে। যতীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সেই গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে ৮ই সেপ্টেম্বর ভোরে ট্রেন ধরবার জন্য বালেশ্বর স্টেশনে এলেন। ট্রেনে উঠতে গিয়ে বুঝলেন, গোয়েন্দা পুলিশ সমস্ত ট্রেনটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি তখন তাঁর সঙ্গী চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ ও নীরেনকে ইশারায় ট্রেন থেকে নেমে আসতে বললেন। ওঁরা এরপর ট্রেন থেকে নেমে রেল লাইনের পাশ দিয়ে ধান ক্ষেত পার হয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। এদিকে পুলিশ এঁদের বাঙালী ডাকাত বলে প্রচার করে ঘোষণা করল যে, এঁদের ধরিয়ে দিলে ইংরেজ-সরকার এর জন্য প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। দিনটি বড় মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। এরই মধ্য দিয়ে বিপ্লবীরা ক্রমে বুড়িবালাম্ নদীর ধারে পৌছে গেছেন। তাদের হাতে পুটুলিতে বাঁধা পিস্তল আর গুলি। জলে নামা চলবে না। তাহলে এগুলো ভিজে যাবে। মাঝিরাও ভয়ে নৌকো পার করে দিলো না। গ্রামের লোকেরা ডাকাত ভেবে তাড়া করলো তাঁদের। তাঁরা তখন ছুটতে ছুটতে একটা পুকুরের ধারে এসে বসলেন। ক্ষুধায় আর পরিশ্রমে দেহ তাঁদের অবসন্ন। এর সঙ্গে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তো আছেই।

তবু দমলে চলবে না। বিপ্লবীকে এগিয়েই চলতে হয়। তাঁর পথ পিছনে নয়, সামনে। বিপ্লব করতে করতে বিপ্লবীকে হয়তো মরতে হতে পারে, কিন্তু বিপ্লব মরতে পারে না। এই বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজ নতুন করে শপথ নিতে হবে। যতীন্দ্রনাথ তো এতদিন বলে এসেছেন, তাঁরা দেশের জন্য মহান্ মৃত্যুকে অক্লেশে বরণ করে দেশের মানুষকে জানিয়ে যাবেন, দেশের জন্য মৃত্যুবরণই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। আজ সেই পরম লগ্নই তো তাঁদের সামনে উপস্থিত। তাহলে আর পালিয়ে বাঁচবেন কেন? ইংরেজের পুলিশ বাহিনী পিছনে ধেয়ে আসছে। দেশের জন্য বীরের মতো প্রাণ দেবার এই শুভক্ষণ।

দূরে ইংরেজসৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চার অনুগামী বিপ্লবীকে নিয়ে একটা ঢিবির আড়ালে ইংরেজসৈন্যদের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরি হয়ে রইলেন। ইংরেজসৈন্য দুদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালালো। একদিকে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবির নেতৃত্বে, অন্যদিকে সার্জেন্ট রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে। কিলবির সৈন্যবাহিনী দূরপাল্লার রাইফেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের কোনো সাড়া না পেয়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী দেশী সৈন্যদের সামনে রেখে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলেছে।

যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর সঙ্গীরা মাউজার পিস্তলে বাঁট লাগিয়ে রাইফেলের মতো ব্যবহারের উপযোগী করে অপেক্ষা করে রইলেন।

ইংরেজবাহিনী যেই কাছাকাছি এল, অমনি যতীন্দ্রনাথ গুলি চালাতে বললেন। হঠাৎ আক্রমণে ইংরেজবাহিনী কিছুটা পিছু হঠে গেল। বিপ্লবীদের গুলিতে বেশ কিছু ইংরেজসৈন্য ধানক্ষেতে লুটিয়ে পড়ল বলেই তারা তা করতে বাধ্য হলো। অবিরাম গুলি চালিয়ে যতীন্দ্রনাথের ডান হাত জখম হলো। চিত্তপ্রিয়র প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো পাশেই। ওকে কোলে তুলতে গিয়ে গুলি লাগলো যতীন্দ্রনাথের পেটে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ গুলি চালাতেই লাগলেন। পাশ থেকে জ্যোতিষ বললেন যে, তাঁর গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—মাত্র আর কয়েকটা আছে। এর মধ্যে যতীন্দ্রনাথের বাঁ-হাতে আর একটা গুলি লাগলো। তখন যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন, এ লড়াই আর চালানো যাবে না। তার নির্দেশে তাই সঙ্গীরা আকাশে সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলো। পুলিশ বুঝলো, বিপক্ষদল আর যুদ্ধ চালাতে চায় না। পুলিশ তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। এসে বন্দী করলো যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গীকে। বাকী একজন হলো শহীদ।

যতীন্দ্রনাথকে আনা হলো কটক হাসপাতালে। হাসপাতালের শয্যায় তিনি পড়ে আছেন নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে। কিন্তু যে সংগ্রাম তিনি করে গেলেন তা শুধু বাংলা বা ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টেগার্টের মতো কুখ্যাত লোকও যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের ও বীরত্বের প্রশংসা না করে পারেননি। তিনি তো অবাক? মাত্র চারজন সঙ্গীকে নিয়ে এই লড়াই! এঁদের হাতে তবু জখম হলো সৈন্যবাহিনীর অসংখ্য লোক। সত্যিই, যতীন্দ্রনাথের এ বীরত্বের তুলনা হয় না।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর। পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাবার জন্য বাঁচিয়ে তুলতে খুব উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু তাদের সেই ইচ্ছা আর পূর্ণ হলো না। ঐ দিনটিতেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি দীপ নিবে গেল।

অসাধারণ মনোবল নিয়ে একদিন যতীন্দ্রনাথ তাঁর দেশের বাড়ীতে একাই একটি বাঘ মারতে যান। তাতে তিনি আহত হলেও বাঘটিকে মারতে সমর্থ হন। এই ঘটনার জন্য তিনি লোকের কাছে 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হন।

'বাঘা যতীন' রূপে তাঁর এই পরিচয়টিকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অম্লান রেখে গেছেন। দেশের মানুষ তাই আজও ভুলেনি তাদের এই 'বাঘা' বিপ্লবীকে, ভুলবে না কোনো দিনও।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। যতীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কী ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল? তাঁর জীবনসংগ্রামের সূত্রপাত কখন কি ভাবে হয়?

২। ছোটবেলাতেই যতীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন?

৩। জীবনের নতুন পথের সন্ধান যতীন্দ্রনাথ কিভাবে কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

৪। যতীন্দ্রনাথ কার কাছে বিপ্লববাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন? পরিপূর্ণভাবে বিপ্লবের কাজে কবে থেকে কিভাবে তিনি নিজেকে সমর্পন করেন?

৫। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী বসু কোথায় কী উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিলেন? এই উদ্দেশ্যের পরিণতি কি হয়?

৬। সশস্ত্র বিপ্লব অভিযানের জন্য কোন্ দিনটিকে স্থির করা হয়েছিল? এই বিপ্লব ক্রমে কিভাবে. কোন্ পথে এগিয়ে গিয়েছিল?

৭। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীদের যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল? এই যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

৮। যতীন্দ্রনাথের 'বাঘা যতীন' নাম কেন হয়েছিল? তিনি তাঁর এই নামের যোগ্যতা পরে কিভাবে প্রমানিত করেছিলেন?

মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

জন্ম ঃ ৬ই জানুয়ারী, ১৮৮০ মৃত্যু ঃ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৯

ঋষি অরবিন্দ। বিপ্লবী অরবিন্দ। তাঁরই ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের উপকণ্ঠে তাঁর জন্ম। আবার শোনা যায়, সমুদ্রের বুকে জাহাজেই তাঁর জন্ম। তাই তাঁর নাম হয় বারীন্দ্রকুমার।
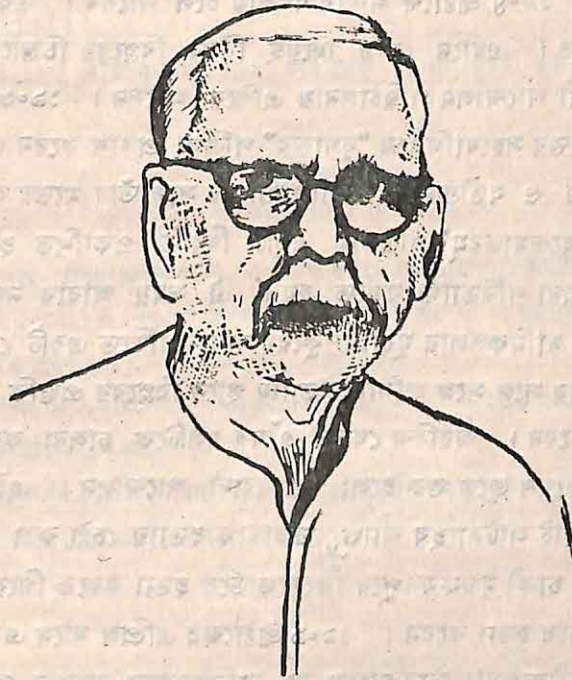
অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন বিলেত-ফেরৎ সিভিল সার্জেন। তিনি নিজে যেমন মনে-প্রাণে ইউরোপীয়ান হয়ে উঠেছিলেন, ছেলেদেরও তেমনি ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হলো না। ভাগ্য তাঁদের নিয়ে গেল অন্য পথে—বিপ্লবের পথে, স্বদেশী আন্দোলনের পথে। এই পথকেই তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বরণ করে নিলেন।

বারীন্দ্রকুমারের দাদা অরবিন্দ তাঁর পড়াশুনার প্রায় সবটাই বিলেতে সম্পন্ন করেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার তাঁর কৈশোর জীবন অতিবাহিত করেন দেওঘরে তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর

স্নেহময় সান্নিধ্যে। এই দেওঘরেরই বিদ্যালয়ে তিনি তাঁর পড়াশুনা শুরু করেন। পরে পাটনা কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ ও সখারাম গণেশ দেওস্কর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটে। এইভাবেই বারীন্দ্রকুমারের অন্তর তখন বিপ্লবের উপযুক্ত উর্বরা ভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এই অন্তর-ভূমিতেই বিপ্লবের বীজ বপন করেন দাদা অরবিন্দ ঘোষ।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে অরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন বিপ্লবের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্যে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। তাই আবার বরোদায় ফিরে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠে মন দেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার বাংলায় চলে আসেন। এবার এসে তিনি যোগ দেন অনুশীলন সমিতিতে। এখানে যোগ দিয়েই তিনি বিপ্লবের চিন্তাকে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বরণ করে নেন এবং বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনায় এগিয়ে আসেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় "যুগান্তর"-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময় বিপ্লবের কর্মপন্থা নিয়ে পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হয়। ফলে এই ব্যাপারে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে "বন্দেমাতরম্"-পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এর পর তাঁদের বিপ্লবের ঐ পথ ও পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। ঐ সময় আবার নতুনভাবে বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে ভেবে বারীন্দ্রকুমার মানিকতলার মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে একটি বোমার কারখানা চালু করেন। এসব কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জসিডি ইত্যাদি স্থানে বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিচালনার জন্যে নতুন করে কেন্দ্র স্থাপন করেন। অরবিন্দ ঘোষই এঁদের দলটিকে চালনা করতেন। এই সময়েই অরবিন্দের নেতৃত্বেই সমস্ত দেশ জুড়ে শুরু হলো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মুহূর্তে বারীন্দ্রকুমারের নির্দেশে ছোট লাটসাহেব অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। আবার তাঁরই নির্দেশে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মুজফফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে মিসেস ও মিস কেনেডিকে বোমা মেরে হত্যা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এসব ঘটনা ঘটে। আর ঐ খ্রীষ্টাব্দেরই মে মাসে বারীন্দ্রকুমার তাঁর দলবল সহ মানিকতলার বাগানে গ্রেপ্তার হন। আলিপুর আদালতে তাঁর বিচার হয়। সেই বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হলে তারই রায় অনুযায়ী তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করবার জন্যে আন্দামানে পাঠানো হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগের জন্যে বারীন্দ্রকুমার আন্দামানে প্রেরিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে বারীন্দ্রকুমারও মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি পেয়ে তিনি বাংলায় কিছুদিন কাটান। তারপর দাদা

অরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিচেরীর আশ্রমে চলে যান। ওখানে তিনি প্রায় ছ'বছর কাটিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে আবার বাংলায় চলে আসেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামান থেকে ফিরে বারীন্দ্রকুমার 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজী পত্রিকা 'দি ডন অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'রামানন্দ লেকচারার' নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো—'আমার আত্মকথা,' 'পথের ইঙ্গিত,' দ্বীপান্তরের বাঁশি,' 'অগ্নিযুগ,' ভারত কোন্ পথে,' 'ঋষি রাজনারায়ন,' 'The Tale of Exile,' 'Sri Aurobindo,'।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মহাবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার লোকান্তরিত হন।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। বারীন্দ্রকুমার কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর 'বারীন্দ্রকুমার' নামকরণের কারণ কি?

২। বারীন্দ্রকুমারের কৈশোর ও শিক্ষাজীবন কোথায় অতিবাহিত হয়? ঐ জীবনের স্তরে তাঁর মধ্যে কিভাবে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটে?

৩। বারীন্দ্রকুমার 'অনুশীলন সমিতে'তে কখন যোগ দিয়েছিলেন? তার পর থেকে তাঁর জীবনের পথে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ কর।

৪। বারীন্দ্রকুমারকে কখন কেন আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল? আন্দামান থেকে কখন তিনি বাংলায় ফিরে আসেন? বাংলায় ফিরে এসে তিনি কী করেন?

———

অমর শহীদ কানাইলাল দত্ত

জন্ম ঃ ৩১শে আগষ্ট, ১৮৮৭ মৃত্যু ঃ ১০ই নভেম্বর, ১৯০৮

পুলিশ ইনস্পেকটর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দিয়েছে। হোক না কেন ইংরেজ সরকারের চাকুরে, তবু তো বাঙ্গালী। সেই বাঙ্গালী হয়ে সে কিনা ধরিয়ে দিলো বাংলা মায়ের বীর সুসন্তান প্রফুল্ল চাকীকে? খবরটা শুনে সমস্ত জাতি লজ্জায় মাথা নোয়ালো, বেদনায় হলো বাক্যহারা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে চলছে আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের বিচার। মুক্তিপাগল বাংলার দামাল ছেলেরা আঘাত হেনেছে প্রচণ্ড প্রতাপ সম্পন্ন ইংরেজশক্তিকে। সারা দেশ তাই একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু বাংলার এই সব বিপ্লবী নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দেশের মুক্তির জন্যে মেতে উঠেছে। এরই পরিণামে এই বিপ্লবীদের কয়েকজন
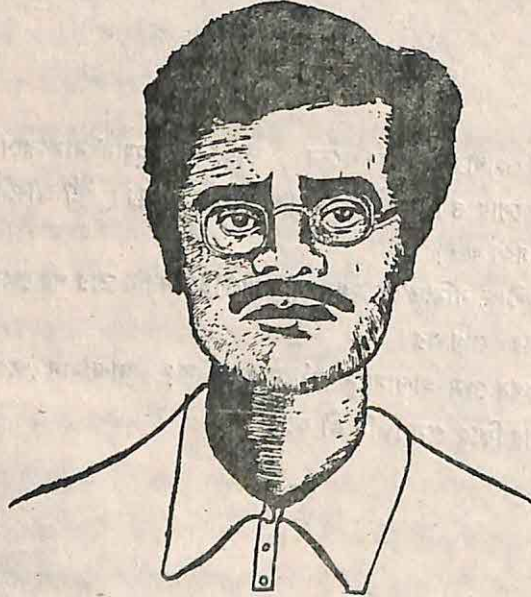
ধরা পড়েছে। ওরা জানে, ইংরেজ রাজত্বে বিপ্লবীদের বিচার তো বিচার নয়, প্রহসন মাত্র। তাই ওরা এও জেনেছে যে, এ বিচার শেষ পর্যন্ত এদের উপহার দেবে ফাঁসির দড়ি।

নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হচ্ছে ঐ বিপ্লবীরা। কিন্তু ওদের মধ্যেও যে মৃত্যুর ভয়ে কাতর বিশ্বাসঘাতক কেউ ছিল, তা জানা ছিল না। নরেন গোসাঁই নামে তরুণটিই বাংলার বিপ্লবীকুলের সেই কলঙ্ক। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সে রাজসাক্ষী হয়েছে। পুলিশের কাছে সে দলের সব গোপনীয় কথা বলে দিয়েছে। সমস্ত বাঙ্গালীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে কলঙ্কের ভার, লজ্জার ভার।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোসাঁই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে বিচারাধীন আসামী হিসেবে একই সঙ্গে জেলের মধ্যে ছিল। নরেন গোসাঁই সম্বন্ধে অন্য সঙ্গীরা নতুনভাবে চিন্তা করতে লাগলো এবং এ ব্যাপারে তারা মনে মনে সিদ্ধান্তও নিলো। সেই সিদ্ধান্তমত কাজও হলো। একদিন হঠাৎ শোনা গেল, ঐ জেলের মধ্যেই কানাইলাল আর তার অন্য বিপ্লবী সঙ্গী সত্যেন্দ্রনাথ বসু নরেন গোসাঁইকে হত্যা করেছে।

জেলের ছিদ্রহীন সতর্ক প্রহরার মধ্যেও কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রনাথ যে কিভাবে এই প্রচণ্ড সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করলো, তা ভেবে সমস্ত জাতি যেমন বিস্মিত হলো, তেমনি লজ্জা আর গ্লানির হাত থেকে বেঁচে গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন সমস্ত জাতির কাছে পেলো দেবতার আসন।

বিচার তো এদিকে চলছিলই। ইংরেজের চোখে অপরাধীর আর এক অপরাধের সন্ধান পাওয়া গেলো। বিচারের রায় বেরোতে এবার আর তেমন দেরী হবার কথা নয়। রায় বেরোলো। কানাইলালের ফাঁসির আদেশ হল। ফাঁসিও হলো।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর। কালীঘাটের মহাশ্মশানে কানাইলালের শেষকৃত্য হবে সেদিন। এই উপলক্ষে কানাইলালের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বেরোবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। খবর শুনে আর কিছু না ভেবে পাগলের মতো ছুটে এলো সবাই ঐ মিছিলে যোগ দিতে। একে-একে ছুটে এসে মিশলো লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলে। মিছিল তো নয়, যেন এক মহাসমুদ্র! আর সেই মহাসমুদ্রে যেন আছড়ে পড়ছে বিরাট বিরাট ঢেউ আর সেখান থেকে উঠছে তুমুল গর্জন। মানুষের কণ্ঠে রণহুঙ্কারের মতো উচ্চারিত হচ্ছে—বন্দেমাতরম্। শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে আর পথের দুদিক থেকে অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। আনন্দে, বেদনায়, গর্বে সবার চোখ ভরে উঠছে জলে। এই চোখের জলেই বাংলার মানুষ সেদিন বিদায় জানালো অমর শহীদ কানাইলালকে।

মিছিল এসে পৌঁছে গেলো শ্মশান ঘাটে। একটু পরেই শ্মশানচিতার আগুনে সব শেষ হয়ে যাবে। জনতার মনেও তখন জ্বলে উঠল উন্মাদনার আগুন। বাংলার অগ্নিশিশু কানাইলালকে শেষ দেখা দেখতেই হবে। সেই শেষ দেখা দেখতে গিয়ে অনেকেই নিলো কানাইলালের পায়ের ধূলি, নিয়ে মাথায় ছোয়ালো। শবদাহের পর আবার চিতাভস্ম নেবার জন্যে পড়ে গেলো কাড়াকাড়ি। অনেকেই তা সংগ্রহ করলো। যারা নিজেরা সংগ্রহ করতে পারলো না, তারা অন্যের কাছ থেকে নিলো। সবাই এই পদধূলিকে মহামূল্য বস্তুর মর্যাদা দিয়ে মাথায় ঠেকালো।

কানাইলালের মরদেহ চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। কিন্তু তার কথা, তার অস্তিত্ব দেশের বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। দেশের মানুষ তাকে ভুলতে পারেনি এবং পারবে না। বিকেলে আবার বেরোলো শোভাযাত্রা। জনতা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে চললো সেই গান—

"আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?"

এই গানের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। কানাইলালের বিচারের কয়েক দিন আগের ঘটনা। আদালতের বাইরে একজন ইংরেজ সার্জেন্ট জনতার উপর অযথা অত্যাচার চালাচ্ছিল। সুশীল নামে পনেরো বছরের এক দুঃসাহসী বালকের চোখে তা পড়লো। সে তখনই সার্জেন্টের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাকে বাধা দিলো। তাতে ঐ সার্জেন্ট রেগে গিয়ে সুশীলকে মারতে শুরু করে। সুশীলও সাহেবকে পাল্টা আঘাত হানে। এতটুকু ছেলে সুশীল পারবে কেন? তাকে বন্দী করে বিচারের জন্যে পাঠানো হলো। বিচারক কিংসফোর্ড সুশীলকে আদালতের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড় করিয়ে পনেরো ঘা বেত মারার আদেশ দিলেন। হাত-পা বেঁধে সুশীলকে নির্মমভাবে বেত মারা হলো। এই বেত মারার ঘটনাটিকে স্মরণে রেখেই কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ এ গান বেঁধেছিলেন।

কানাইলালের বাড়ী শ্রীরামপুরে হলেও তার জন্ম হয়েছিলো মামার বাড়ী চন্দননগরে। খুব ছোটবেলায় বাবার কাছে বোম্বাই-এ থেকে সেখানকার আর্ট কলেজে কিছুদিন পড়াশুনার চর্চায় কাটে। তারপর আবার মামার বাড়ী চন্দননগরে ফিরে এসে ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হয়। সেখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করে।

ডুপ্লে কলেজে পড়বার সময় কানাইলাল সেই কলেজেরই অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসে। গভীর স্বদেশপ্রেম ছিল এই চারুচন্দ্রের। স্বদেশকে তিনি মায়ের মতোই মনে করতেন। ছাত্রজীবনে কানাইলাল এই স্বদেশ প্রেমিক অধ্যাপকের কাছেই স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা গ্রহণ করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। দেশ তখন বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে মেতে উঠেছে। ছাত্র কানাই-লালের অন্তরও এই মাতনে মেতে উঠলো। এই সময়েই আবার কলকাতার মানিকতলায় মুরারি-পুকুরে এক বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় একটি গুপ্ত বিপ্লবীচক্র গড়ে উঠে। অধ্যাপক চারুচন্দ্রই এই বিপ্লবীচক্রের সঙ্গে কানাইলালের যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেন। তারপর থেকেই অবিরাম গতিতে চলে তার বিপ্লবের সাধনা। এই সাধনায় কানাইলাল ছিল এত একাগ্র, এত নিষ্ঠাবান ও এত সাহসী যে কোনো ভয় কোনো প্রলোভন তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত করতে পারেনি।

মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির সামনে দাঁড়িয়েও কানাইলাল ছিল অবিচল, নির্ভীক। ম্যাজিস্ট্রেট যখন নরেন গোসাঁই-এর হত্যা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলেন, তখন সে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল —"নরেন গোসাঁই ছিল দেশদ্রোহী। আমিই তাকে গুলি করে হত্যা করেছি।"

সেশান আদালতের জজসাহেব যখন তার বিরুদ্ধে মামলায় সে কোনো উকিল দেবে কিনা জানতে চাইলেন, তখন কানাইলাল তেমনি কঠিন স্বরে জানালো—"না।"

তারপর জজসাহেব বললেন—"ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তোমার দেওয়া জবানবন্দী তুমি ইচ্ছে করলে প্রত্যাহার করতে পার।"

কানাইলাল জজসাহেবের এই কথার উত্তরেও একই রকম অবিচল রইলো। সে বললো—"আমি আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি। নরেন গোসাঁইকে হত্যার জন্যে যে আমি দায়ী, এ কথা অস্বীকার করবার কোনো প্রশ্ন উঠে না। আমি অস্বীকারও করছি না।"

আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণে কানাইলালের যখন মনে হয়েছিল, সত্যেনের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ নেই, তখন সে সত্যেনকে বাঁচাবার কথা ভাবলো। এই ভেবে সে কথা পালটে সত্যেনকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত সত্যেনকে সে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু তার এই চেষ্টার মধ্যে তার বীরত্ব ও মহত্বের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে রইলো।

মরণজয়ী কানাইলাল। অক্লেশে জয় করেছে সে মৃত্যুভয়কে। তাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে সে বিন্দুমাত্র কাতর হলো না বরং বিপ্লব সাধনার শেষলগ্নে তার আত্মমগ্নতা বেড়ে গেলো—বেড়ে গেলো তার দেহের ওজন।

তারপর সমস্ত দেশবাসীর অন্তরের অর্ঘ্য গ্রহণ করে গৌরবময় মৃত্যু বরণ করলো বাংলার আর এক অবিস্মরণীয় বিপ্লবসাধক।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। কানাইলালের বাড়ী কোথায় ছিল ? তার জন্ম কোথায় হয় ? তার ছাত্রজীবন কিভাবে কাটে ?

২। কানাইলালের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা কিভাবে ঘটে ?

৩। কোন্ ঘটনার জন্যে কানাইলালকে গ্রেপ্তার করা হয় ? জেলে সে নরেন গোসাঁইকে হত্যা করে কেন ?

৪। আদালতে বিচার চলার সময় কানাইলাল ম্যাজিস্ট্রেট্ ও সেশান জজের কথার উত্তরে কী বলেছিল ? ঐ সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বাঁচাবার জন্যে কী চেষ্টা সে করেছিল ? তাতে তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

৫। কানাইলালের মৃতদেহ নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তার বর্ণনা দাও।

৬। "আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?…"
—এই গান কখন গাওয়া হয়েছিল ? গানটি কে, কখন রচনা করেছিলেন ?

———

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম ঃ জানুয়ারী, ১৮৮২ মৃত্যু ঃ ২১শে নভেম্বর, ১৯০৮

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার অশেষ অবদান। এই জেলাতেই জন্মেছিলেন বীর বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বাবার নাম অভয়চরণ বসু। তিনি এক সময় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেই সময় তিনি পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের স্কুলেই ভর্তি করে নেন। ছাত্রজীবনের প্রথম ধাপ থেকেই বাবার কাছ থেকে নানা দেশের গল্প শুনতে শুনতে সেই সব দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই তাঁর জানা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে

তাঁর জানার আগ্রহ যখন বেড়ে উঠতে লাগলো, তখন শুধু গল্প শুনেই তাঁর তৃপ্তি হলো না। নিজে নানা বই পড়ে তাঁর এই জানার সাধ মেটাতে লাগলেন। এইভাবে ভারতবর্ষের কোথায় কী ঘটছে জানবার জন্যে সব সময় উতলা থাকতেন। রোজ রোজ নতুন নতুন সংবাদ তিনি জানতে চাইতেন। সংবাদপত্র ছাড়া আর কিসের মাধ্যমে এরকম খবর জানতে পারবেন? পাড়াগাঁয়ের ছেলে—রোজ রোজ সংবাদপত্রই বা পাবেন কোথায় কার কাছে? তবু যারা কলকাতায় যাতায়াত করতেন তাঁদের কাছ থেকে সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পড়তেন। দেশকে জানবার জন্যে কী অসীম ছিল তাঁর আগ্রহ। এছাড়া বিপ্লবীদের জীবনী, বিপ্লবের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন তাঁর বাবার কাছে। শুনে তাঁর মন তৃপ্তিতে, আনন্দে, গৌরবে ভরে উঠতো।

বাবা ছাড়াও বাড়ীতে দাদা জ্ঞানেন্দ্র নানা দেশের বই এনে পড়তেন বলে তাঁর কাছ থেকেও অনেক বিষয় জানার সুযোগ হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এর মধ্য দিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্র থাকা কালেই স্বদেশ সম্পর্কে ভাববার উৎসাহ ও প্রেরণা বোধ করতেন। তাঁর এই স্বদেশ-ভাবনার কথা, বিপ্লবের কথা অন্য ছাত্রদেরও বলতেন। তাতে তিনি অচিরেই ছাত্রদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের সেরা। খেলাধুলায় তিনি ছিলেন প্রায় অদ্বিতীয়। এইজন্যে শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছেও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর সুন্দর ব্যবহারের আকর্ষণে একবার যে তাঁর কাছে আসত, সে আর তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারতো না। ছাত্ররা সবাই ক্রমে হয়ে উঠল একেবারে তার বশীভূত।

এভাবে দিন যেতে সত্যেন্দ্রনাথের অনেক বন্ধু জুটতে লাগল। তাদের নিয়ে গ্রামের কল্যাণমূলক কাজে লেগে গেলেন তিনি। গ্রামের মানুষ তাতে তঁাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগল। এসব কাজ করতে গিয়ে পড়াশুনাকে বাদ দিলেন না তিনি। ভালোভাবেই এণ্ট্রান্স পাশ করলেন। তারপর মেদিনীপুর কলেজেই এফ, এ, পড়তে লাগলেন। ঠিক এই সময়েই তঁার বাবা মৃত্যু বরণ করলেন। এর মধ্যেই এফ, এ, পাশ করে বি, এ, পড়তে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। এখানে সবাই তঁার নতুন নতুন অচেনা সাথী। তঁাকে ভালো করে কেউ জানে না। কিন্তু তঁাকে জানতে তঁার সাথীদের বেশি সময়ও লাগল না। নিজের স্বভাবের গুণেই তিনি সবাইকে কাছে টেনে নিতে পা লেন। সবাই ভালোবেসে ফেলল তাঁকে।

কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথের এক কাকা থাকতেন। তাঁর নাম রাজনারায়ণ বসু। তিনি ছিলেন একজন সুবিখ্যাত জাতীয়তাবাদী দেশকর্মী। তাঁরই কন্যার দুই পুত্র হলেন অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার। পরবর্তী কালে এঁরা দুজনেই বাংলায় বিপ্লববাদের প্রচারকার্যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন অবশ্য বিপ্লবীদের কাজকর্ম তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। তখন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সবেমাত্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের নেতৃত্বে আর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও কংগ্রেস ও তার নেতাদের সমালোচনা হতে লাগলো তীব্রভাবে। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ'-পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার কথা বলে আরো বললেন যে, কংগ্রেস সেই সময় মাত্র একটি সীমাবদ্ধ শ্রেণীর প্রতিনিধি হতে পারত, সমগ্র জাতির নয়। বাংলা থেকে প্রচারিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতেও কংগ্রেসের কর্তা-নির্ভর নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়।

এই সব পত্র-পত্রিকা পড়তে পড়তেই সত্যেন্দ্রনাথ দিনরাতের অনেক সময় কাটিয়ে দেন।

এর ফলে তাঁর মনে কংগ্রেস সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব জেগে উঠে। বই পড়া আর রাজনৈতিক চিন্তায় এরকম মগ্ন থাকার ফলে বি, এ, পরীক্ষার জন্যে একেবারেই তৈরি হতে পারেননি। এর মধ্যে তাঁর মাঝে মাঝেই জ্বর হতে লাগলো। দিনের পর দিন যায়। জ্বর আর সারে না। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, সত্যেন্দ্রনাথের যক্ষ্মা হয়েছে। একদম দেরি না করে কিছুদিনের জন্যে তাঁর কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া দরকার। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে যেতে চাইলেন না। কলকাতায় তখন বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি, অনুশীলন সমিতি স্থাপনের কথা চলছে। এ অবস্থায় তিনি কলকাতা ছেড়ে যান কী করে? শেষ পর্যন্ত মা তারাসুন্দরী তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালেন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে চলে এলেন ওয়াল্টেয়ারে। বাংলার বাইরে ভারতের সব জায়গাতেই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে প্রস্তুতি চলছে। ওয়াল্টেয়ারে এসে তিনি আরও নানা জায়গা ঘুরে, নানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাদের মতামত জানলেন।

শরীরটা একটু সারতেই সত্যেন্দ্রনাথ আবার বাংলায় ফিরে এলেন। তবে কলকাতায় নয়, নিজের জেলা মেদিনীপুরে। তিনি ভাবলেন, নিজের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সবার আগে মেদিনীপুরেই একটা সমিতি গড়ে নিতে পারলে ভালো হয়। এই সমিতির মাধ্যমেই তৈরী করতে হবে এমন সমস্ত কর্মী, যারা দেশ ভালোবাসবে।

মেদিনীপুরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ দেখলেন, এর মধ্যেই সেখানে একটা গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেশিদিন আগে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বোঝা গেল, এখানকার লোক একেবারে বসে নেই। সত্যেন্দ্রনাথ এই সমিতিতেই যোগ দিয়ে সমিতির কাজকে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করে দিলেন। অনেক কর্মী বন্ধুও এসে সমিতির কাজে যোগ দিল। সত্যেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন তাদের নেতা।

এদিকে ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেবার কাজেও লেগে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। মনের মত করে তাদের গড়তে লাগলেন। সেই সঙ্গে তরুণদের শিক্ষাদানের কাজেও নিজেকে যুক্ত রাখলেন। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপযুক্ত ভাবে চলতে লাগলো এই শিক্ষাদানের কাজও।

মেদিনীপুরে যে গুপ্তসমিতি গড়ে উঠেছিল, তার কথা সমিতির সদস্যদের বাইরে কেউ বড় একটা জানতো না। সমিতির সদস্যরা গোপনে গোপনে কাজ করেন, তা না হলে তো পুলিশের গুপ্তচররা যে-কোনো মুহূর্তেই তাদের ধরে ফেলতে পারে। তবে সত্যেন্দ্রনাথ ধরা পড়বার মতো কার্যক্রমের অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে বড় একটা করতেন না। ছেলেদের খেলাধুলা, ব্যায়াম করাতেন। ছেলেদের দিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করাতেন। এর ফলে লোকে জানত, এই সমিতি আসলে স্বাস্থ্যচর্চার জন্যেই আর অবসর মত সমাজসেবার জন্যে। কিন্তু সমিতির এই বাইরের কাজকর্মের আড়ালে অন্যরকম কাজকর্মের অনুষ্ঠান হতো। গোপনে গোপনে এই সমিতির সদস্যরা বন্দুক ছোঁড়া, লাঠি ও তলোয়ার চালানো শিখত।

কাঁসাই নদীর ধারে বনের মধ্যে একটি ভাঙা ভুতুড়ে বাড়ির ভিতরে ছিল গুপ্ত সমিতির আড্ডা। ওখানে যখন এইরকম কার্যকলাপ চলছে, তখন এলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। তিনি অনেক কষ্টে প্যারিস থেকে নিজের চেষ্টায় বোমা তৈরী করা শিখে এলেন। তিনি সেই ভাঙা বাড়ীতে বোমা তৈরীর একটা কারখানা স্থাপন করলেন। দলের অন্তরঙ্গ সদস্য ছাড়া এ সমস্ত ব্যাপার আর কেউ জানতো না।

সত্যেন্দ্রনাথ এই গুপ্ত সমিতির কাজকর্মের মধ্য থেকে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বিপ্লবীটিকে আবিষ্কার করেছিলেন—তিনি ছিলেন তরুণ ক্ষুদিরাম। তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গড়ে তুললেন সত্যেন্দ্রনাথ। মেদিনীপুরের এই সমস্ত সমিতি কলকাতার মুরারিপুকুরের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতো। কলকাতার এই সমিতিটি যখন সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপযুক্ত কর্মী চেয়ে পাঠাতো, তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। ক্ষুদিরামও এইভাবেই কলকাতার গুপ্ত সমিতির কাজে যোগ দিতে যান। কিন্তু তখন সত্যেন্দ্রনাথ কি জানতেন, ক্ষুদিরাম আর তাঁদের কাছে ফিরে আসবেন না? তাঁর হাতে তৈরী ছাত্রই হবে দেশজননীর পরাধীনতা মোচনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক?

ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোমা মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন। তাঁর মুক্তির জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় ছাত্র ক্ষুদিরাম দেশের জন্যে প্রাণ দিলো গুরুর আগেই। সত্যেন্দ্রনাথের দুচোখ জলে ভরে উঠল। শোকে-দুঃখে ততটা নয়, যতটা আনন্দে। গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর সত্যেন্দ্রনাথ দাদার বাড়ীতে চলে এলেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। এখন তো আর কোনো কিছুই বিশেষ গোপন নেই! পুলিশ সবই জেনেছে। এ অবস্থায় সহজে তাঁকে ছেড়ে দেবে না। এর জন্যে তাঁর অবশ্য ভাবনা নেই। শিষ্য যদি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারে, গুরুকেও তো কিছু মূল্য ধরে দিতেই হবে। একদিন পুলিশ এলো। পালাবার চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। তবু ধরা পড়লেন। সমস্ত কলকাতা ছেকে বিপ্লবীদের ধরে জেলখানা ভরে ফেলল পুলিশ। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, কানাইলাল, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, নরেন্দ্র গোসাঁই সবাই ধরা পড়ে সেখানে উপস্থিত। আলিপুরের বোমা তৈরীর মামলায় আসামী করা হলো সবাইকে।

১৯০৮ সাল। ভারতের ইতিহাসে এই সালটি অনেক দিক দিয়েই স্মরণীয় হয়ে আছে। এই সালের ১লা মে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েছিলেন। আত্মহত্যার দ্বারা তিনি সেই ধরা পড়ার অপমান ঢেকে দিতে পেরেছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর ধরা পড়ার দিনেই ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন অন্য জায়গায়। তাঁর ফাঁসি হয় ঐ বছরেরই ১১ই আগষ্ট। এই ১৯০৮ সালেই ঘটল আর একটি ঘটনা। তা ঘটল নরেন্দ্র গোসাঁইকে নিয়ে।

জেল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন বাইরে থেকে রিভলবার যোগাড় করে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন ধনীর দুলাল জেলখানার দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মুক্তির জন্যে অন্যরকম পরিকল্পনা করলেন। দুর্বল প্রকৃতির মানুষ নরেন্দ্র গোসাঁই পুলিশের ফাঁদে পা দিয়ে বিপ্লবীদের গোপন তথ্য সব ফাঁস করে দেবার ফন্দি আটলেন। বিপ্লবীরা প্রমাদ গুণলেন। তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগলেন নরেন্দ্রর প্রতি। বিপ্লবীরা নরেন্দ্রকে মেরে ফেলতে পারে, এই ভয়ে পুলিশ তাঁকে অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতেও বিপ্লবীরা বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু কিভাবে তা করা যায়? এর জন্যে একটা রিভলবার তো অবশ্যই চাই। এজন্যে যোগাযোগ করা হলো হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গে। গোপন পরিকল্পনা মত ফলমূল আসতে লাগলো। একদিন সেই ফলমূল সত্যেন্দ্রনাথকে দেবার জন্যে কানাইলালকে দেওয়া হলো। কানাইলালের কেমন যেন সন্দেহ হলো। ফলমূল ছাড়াও এর মধ্যে অন্য কিছু আছে। কী আছে জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করায় সত্যেন্দ্রনাথ বলব না করেও শেষে বলে ফেললেন। ভাবলেন, তিনি নিজে অসুস্থ কোনো সময় তাঁর একার পক্ষে যদি কাজটা গুছিয়ে আনা সম্ভব না হয়, তখন কানাইলালের মতো বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। নরেন গোসাঁইকে যে করেই হোক শাস্তি দিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যেই শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলো। নরেন গোসাঁই বিশ্বাস ঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি পেলো। বাঙালী হলেও অন্য এক বাঙালী যখন দেশ-মাতৃকার কাজে বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠল, তখন তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষমা করতে পারেননি। ব্যক্তির চেয়ে দেশ ও জাতি হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে বড়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই মহান্ কার্যপ্রণালীর দ্বারা বিপ্লবীদের সামনে এক উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, যা কোনো দিন ম্লান হবার নয়।

এই মহান্ বিপ্লবীকে দেশ হারালো ২১শে নভেম্বর, ১৯০৮ সালে। সেই দিন ভারতমাতার চোখ থেকেও বুঝি কয়েক কোঁটা অশ্রু ঝরে পড়েছিল।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পিতার নাম কী ছিল? তিনি কী করতেন? পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ের গল্প শুনতেন?

২। সত্যেন্দ্রনাথের মনে দেশ-বিদেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ কিভাবে সৃষ্ট হয়েছিল? এই আগ্রহ দূর করবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ কী করতেন?

৩। সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে কেমন ছিলেন? বি, এ, পড়তে তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? বি, এ, পরীক্ষা দেবার পথে কিভাবে বাধা দেখা দিলো?

৪। কোন কোন্ পত্রিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং কী জানতে পেরেছিলেন তাঁর মনে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?

৫? শরীর সারাবার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ কোথায় গিয়েছিলেন? প্রথমে তিনি সেখানে যেতে চাননি কেন? সেখানে যাওয়ায় তাঁর কী লাভ হলো?

৬। শরীর সারবার পর সত্যেন্দ্রনাথ কোথায় ফিরে এলেন এবং কী কী কাজ করলেন?

৭। সত্যেন্দ্রনাথের গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম কিভাবে চলতো? বাংলার বিপ্লবে এই সমিতির অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের নাম কেন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, বুঝিয়ে দাও।

———

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

জন্ম : ২৫শে মে, ১৮৮৬ মৃত্যু : ২১শে জানুয়ারী, ১৯৪৫

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বাল্যকাল কাটে চন্দননগরে। চন্দননগর তখন ফরাসীদের অধিকারে। সেই চন্দননগরের সুসন্তান দেশের গৌরব এই রাসবিহারী। ১৮৮৬ সালের ২৫শে মে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে তাঁর জন্ম।

রাসবিহারী পড়াশুনা করেন চন্দননগরে মর্টন স্কুলে ও ডুপ্লে কলেজে। এই পড়াশুনার সময়েই চন্দননগরের অধ্যাপক চারু রায়ের সংস্পর্শে আসেন তিনি। অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মোতি রায় প্রমুখ তরুণরা যে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন এবং কলকাতার

মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে যে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠে রাসবিহারী পরে ঐ দলগুলির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

এরপর ক্রমে ক্রমে রাসবিহারীর বিপ্লবী জীবন একটা পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়। বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার মত শক্তি তখন তাঁর আয়ত্তে। বাংলায় ব্যাপকভাবে বিপ্লব ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হলে রাসবিহারী তখন হলেন সেই সময়কার তরুণ বিপ্লবীদের মন্ত্রদাতা। বাংলার বাইরে,

স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে তিনি বিপ্লবী দল গঠন করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী এই সময়ে তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

১৯০৪ সালে সাহারাণপুর প্রবাসী বাঙালী জে, এন, চ্যাটার্জী একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির বিপ্লবী সদস্যরা জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে জীবনদানের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। রাসবিহারী তখন দেরাদুনের একটি সরকারী অফিসের কর্মচারী ছিলেন। তিনি ঐ অফিসে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন যে, কেউ তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ পেতো না। ঐ সময়েই জে, এন, চ্যাটার্জীর সঙ্গে রাসবিহারীর যোগ স্থাপিত হল। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবী সঙ্ঘ ও ঢাকার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে রাসবিহারীর যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। এর ফলে রাসবিহারী অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে বাংলায়, পাঞ্জাবে ও যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তুলতে লাগলেন। তাঁর এই বিরাট কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হলেন আমীরচাঁদ, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ প্রমুখ বিপ্লবীরা।

১৯১২ সালে রাসবিহারী ও তাঁর সহকর্মী বসন্ত বিশ্বাস একটি দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেন। ভারতের রাজধানী তখন আর কলকাতা নয়, দিল্লী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তাই তাঁর দিল্লীর প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন শোভাযাত্রা করে। পথে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে বোমা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাসবিহারী বসন্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে করে। বড়লাটের গাড়ি যেই তাঁদের সামনে এল, অমনি বসন্ত বিশ্বাস সেই গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন। বোমার আঘাতে নিহত হল একজন ছত্রধারী, বড়লাট আর তাঁর স্ত্রী হলেন আহত। এই ঘটনা সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পরেও পুলিশ রাসবিহারীকে ধরতে পারেনি, এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত জানতে পারেনি। এরপর লাহোরের পুলিশ ক্লাবে ও লাহোরের পুলিশ কমিশনারকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা যখন বোমা মারল তখনই মাত্র পুলিশ জানতে পারল এই বিপ্লবীদের নায়ক হলেন রাসবিহারী। তখনও তিনি সরকারী চাকরী করছেন। এ অবস্থায় নাম প্রকাশ হয়ে পড়াতে তিনি দেরাদুন ছেড়ে চলে গেলেন। এরপর উত্তর ভারতের নানা জায়গা থেকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতে লাগলেন।

১৯১৪ সাল। শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজ এই যুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে জড়িয়ে পড়ল। রাসবিহারী এই পরিস্থিতিকে তাঁদের বিপ্লবের কাজে লাগাতে চাইলেন। এর মধ্যে বাঘা যতীনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। দুজনে মিলে ঠিক করলেন ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ

ঘটাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রাসবিহারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে এবং আমেরিকার গদর পার্টির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। রাসবিহারীর আবেদনে এঁরা সাড়া দিলেন—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন।

রাসবিহারী নিজেও লাহোর, মীরাট, আম্বালা প্রভৃতি সেনানিবাসে ঘুরে ঘুরে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এর মধ্যে আর এক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে জার্মানিতে গেলেন। ঠিক হল, অস্ত্রবোঝাই জাহাজ সুন্দরবন অঞ্চলে ভিড়লে বাঘা যতীন তাঁর দলবল নিয়ে সেইসব অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস করবেন, তারপর সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের অনুগত সেনাবাহিনীর কাছে। দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদলের, সেই জাহাজ এসে ভারতে পৌছতেই পারল না। মাঝখানে বাঘা যতীন তাঁর চার জন সঙ্গী নিয়ে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম করে প্রাণ দিলেন।

এর মধ্যে কৃপাল সিং নামে এক বিপ্লবী রাসবিহারীর সব পরিকল্পনার কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিলেন। এই সূত্র ধরে পুলিশ অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করল। মামলা শুরু হল। এই মামলা 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' নামে বিখ্যাত। এই মামলার বিচারে বহু বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল।

এবারও কিন্তু রাসবিহারীকে ধরতে পারল না পুলিশ। তিনি পালিয়ে চলে গেলেন একেবারে জাপানে। বিদেশে গিয়ে রাসবিহারী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। সেখানে বসেও তিনি মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপান যে-সব জায়গা অধিকার করেছিল, সেখানকার ভারতীয়দের নিয়ে ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ টোকিওতে এক সমাবেশের আয়োজন করলেন রাসবিহারী। সেখানে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। জাপানীদের কাছে যে-সব ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের নিয়ে সেই প্রস্তাব অনুসারে পরে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' স্থাপিত হয়। সে হল ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চরম অবস্থায়।

রাসবিহারীর প্রস্তাব অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল তার সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসুই। এরপর ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলে তাঁর হাতেই রাসবিহারী তুলে দিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সমস্ত দায়দায়িত্ব।

নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যে কতখানি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে-কথা আর কারো অজানা নেই। কিন্তু নেতাজীর এই বিরাট দুঃসাহসিক

কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা ছিলেন রাসবিহারী বসু। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নামটি তাই সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে—ভারতবাসীর চিত্তে তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে লালিত হবে।

১৯৫৫ সালের ২১শে জানুয়ারী বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু জাপানে দেহান্তরিত হন।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। রাসবিহারীর বাল্যকাল কোথায় কাটে? তাঁর বিপ্লবী জীবন কিভাবে গড়ে উঠে?

২। রাসবিহারীর বিভিন্ন সময়ের সহযোগীদের নাম উল্লেখ কর। তাঁরা কখন কিভাবে রাসবিহারীকে সাহায্য করেছিলেন?

৩। রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতে ও ভারতের বাইরে কিভাবে স্বাধীনতা-আন্দোলন গড়ে উঠে ও পরিচালিত হয়?

৪। 'লাহোর' ষড়যন্ত্র মামলা কী? এই মামলা কেন হয়েছিল? এই মামলার ফল কী হয়েছিল?

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা

জন্ম : ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ মৃত্যু : ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ

ইংরেজী ১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও চলছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সামনে সে এক ঘোরতর সঙ্কট, মহাপরীক্ষার মুহূর্ত।

ইংরেজের অধীন ভারতেও এসে সেই যুদ্ধ-তাণ্ডবের ঢেউ লেগেছে। সারা দেশ হয়ে উঠেছে চঞ্চল। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে তখন একটিই প্রতিজ্ঞা—অত্যাচারী বিদেশী শাসক ইংরেজকে যে-কোনো ভাবেই হোক বিতাড়িত করতে হবে।

পরাধীন থাকার যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা-লাভের দুরন্ত ইচ্ছা ভারতের প্রতিটি মানুষের প্রাণে প্রচণ্ড আলোড়ন তুললো। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ বলে কোনো ভেদ রইলো না। এর মধ্যেই একেবারে প্রথম সারিতে অন্যতম প্রধান হয়ে এগিয়ে এলেন নিঃসন্তান নিরক্ষর মাতঙ্গিনী হাজরা।

মাতঙ্গিনী ছিলেন দরিদ্র কৃষক পিতা ঠাকুরদাস মাইতির সন্তান। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অধীন হোগলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। 'গান্ধী বুড়ি' বলেই তাঁর পরিচিতি ছিল বেশি।

১৯:২ সালে স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে এলেও দেশের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে মাতঙ্গিনীর যোগাযোগ আরও আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে লবণ আইন অমান্য করে গ্রেফতার বরণ করেন। ঐ বছরেই তমলুক গভর্ণরের দরবার চলার সময় শোভাযাত্রা বের করার জন্যে তাঁকে জেলে যেতে হয়।

এরপর মুক্তি-আন্দোলনের জোয়ার তুমুল হয়ে উঠে ১৯৪২ সালে। আন্দোলনকারীরা যত মেতে উঠলো, ইংরেজের অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়ে গেলো। কিন্তু ভারতবাসী তাতে দমলো না, বরং আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। ৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে গ্রহণ করা হলো সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাব—'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো!' আর পরদিনই ৯ই আগষ্ট দেশের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত নেতাকে ইংরেজ সরকার কারারুদ্ধ করলো।

কারাগারের ভয়ও কিন্তু তখন আর জেগে-উঠা যুবশক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারলো না, দমিয়ে রাখা যায়ও না। ঠিক এই মুহূর্তেই দেশবাসীর কানে এলো মহাত্মাজীর সেই উদাত্ত আহ্বান। উন্মাদনায় উত্তেজনায় কেঁপে উঠল সারা দেশ। মহাত্মাজী বললেন, যুদ্ধ চলছে, ইংরেজের অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। ইংরেজের উপর আঘাত হানার এই হল, উপযুক্ত সময়। গোটা দেশ তা মেনে নিলো। তৈরি হলো আঘাত হানবার জন্যে।

ঐ সময়েই মেদিনীপুরে যে-আন্দোলন গড়ে উঠল এবং এই আন্দোলনে মেদিনীপুর যে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করলো, তা ভুলবার নয়। বৃটিশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই স্থানে উড়িয়ে দিলো ভারতের জাতীয় পতাকা।

ইংরেজও পাল্টা আঘাত হানলো। প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেদিনীপুরের উপর। অসংখ্য বিপ্লবী প্রাণ দিলো এই পুলিশী তাণ্ডবের ফলে। কিন্তু দেশের মানুষ প্রতিজ্ঞা থেকে একতিল সরে গেলো না। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'—গান্ধীজীর এই কথাকে মন্ত্রের মতো জপ করতে করতে দেশকে স্বাধীন করবার সংকল্পে আরো অবিচলিত, আরো কঠিন হলো তারা। শুরু হলো প্রচণ্ডতম লড়াই। এ লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করে মাতঙ্গিনী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মাতঙ্গিনী তখন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা। তমলুক থেকে আট মাইল দূরে একটি ছোট্ট গ্রামে তিনি থাকতেন। কিন্তু দেশের মুক্তিআন্দোলন থেকে তিনি দূরে থাকতে পারেননি। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের সেই আগুন-ঝরা দিনগুলিতে তিনি মেদিনীপুরের বীর সন্তানদের সঙ্গে এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

মুক্তি-সংগ্রামী মানুষের মিছিল এগিয়ে চলছিল তমলুকের পথ ধরে। এই মিছিলে সভার আগে আগে জাতীয় পতাকা হাতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন 'গান্ধী বুড়ি' মাতঙ্গিনী। বয়সে বৃদ্ধা হলেও মনের বলে ও সাহসে তিনি তরুণকেও যেন হার মানিয়ে দেন।

মিছিল এগিয়ে চলেছে তমলুকের আদালত আর থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার উদ্দেশ্যে। মাতঙ্গিনীকে সামনে রেখে আট মাইল পথ পেরিয়ে মিছিল তমলুকের কাছাকাছি এসে গেলো, আর রাইফেলধারী পুলিশবাহিনীও গর্জন করে উঠলো—সাবধান! আর এগোবে না। এগোলেই আমরা গুলি ছুঁড়ব।

কিন্তু মুক্তি-পাগল বীর সন্তানদের সেদিন বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে থামাতে পারলো না ইংরেজের পুলিশবাহিনী।

এগিয়ে চললো মুক্তি-বাহিনী। মাতঙ্গিনী চলেছেন সবার আগে। হাতে জাতীয় পতাকা কণ্ঠে সেই হুঙ্কার-ইংরেজ ভারত ছাড়ো। সেই সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই মহামন্ত্র—বন্দেমাতরম্।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো পুলিশবাহিনীর রাইফেল। মুক্তি-পাগল বীর সন্তানরা আকাশ-বাতাস মুখর করে তার চেয়ে তেজে গর্জে বললো—বন্দেমাতরম্!

তবু এগিয়ে চলা থামলো না। ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে চললেন মাতঙ্গিনী। একটা গুলি এসে লাগলো তাঁর হাতে। ঐ হাতেই ধরা ছিল পতাকাটি। হাত জখম হলেও পতাকা ছাড়েন নি। দৃঢ় বলে ধরে রেখে বলে উঠলেন—বন্দেমাতরম্!

এবার একের পর এক গুলি এসে লাগলো মাতঙ্গিনীর কপালে ও দেহের নানা জায়গায়। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কিন্তু পতাকাটি তখনও তিনি ধরে রেখেছেন শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে। ইংরেজ বাহিনী তাঁর প্রাণ কেড়ে নিলো গুলির আঘাতে, কিন্তু হাতের পতাকাটি কেড়ে নিতে পারেনি। এই হল বাংলার তথা ভারতের অবিস্মরণীয় বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা, তিয়াত্তর বছর বয়সেও যিনি সংগ্রামের এক তুলনাহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন দেশবাসীর সামনে।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। মাতঙ্গিনী হাজরার পিতা কে ছিলেন? মাতঙ্গিনীর জন্ম হয় কোথায়? কোন সময়ে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন?

২। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কখন কিভাবে গড়ে উঠে? এই আন্দোলনে মাতঙ্গিনী কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

৩। মাতঙ্গিনী কোন নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন? 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণের পূর্বে মাতঙ্গিনী আর কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল?

৪। দেশের মুক্তির জন্যে লড়াই করতে গিয়ে মাতঙ্গিনী যেভাবে প্রাণ হারালেন, তার বর্ণনা দাও।

—০—

মহাধিনায়ক সূর্য সেন

জন্ম ঃ ২ শে মার্চ ১৮৯৪

মৃত্যু ঃ ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

ইংরেজ পুলিশবাহিনীর সঙ্গে বুড়িবালামের তীরে চার বিপ্লবী শিষ্য নিয়ে মহাবিপ্লবী 'বাঘা' যতীনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্বদেশ থেকে গিয়ে জাপানে আত্মগোপন—এ-সব ঘটনা ঘটে যাবার পর কিছুকালের জন্যে দেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে যায়। বেশ কয়েক বছর বিপ্লবীরা যেন বড়-সড় বিপ্লবের আগুন ছড়ানো থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখলো।

বিপ্লব যাদের রক্তে, বিপ্লবের মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, তারা সাময়িক ভাবে ঝিমিয়ে পড়লেও একদিন-না-একদিন গর্জে উঠে। হলোও তাই। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস। সারাদেশ চমকে উঠে শুনলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দুঃসাহসিক ঘটনার কথা। কেউ যেন ভাবতেই পারছে না যে, এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটলো, অসম্ভব মনে হলেও তা ঘটলো। আর এমন ঘটনা যিনি ঘটালেন, তিনি হলেন সূর্য সেন—চট্টগ্রামে যিনি পরিচিত ছিলেন 'মাস্টার-দা' নামে।

১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে সূর্য সেনের জন্ম হয়। ১৯১৮ সালে বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করে তিনি চট্টগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব বহন করতে থাকেন। তখন থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন সবারই 'মাস্টার-দা'। আর সেই সময় থেকেই তরুণ ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী দল গঠন করবার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এলো।

এরপর ঘটলো একটি ঘটনা, যা সারা দেশকে একই সঙ্গে করে দিলো শোকাহত এবং উত্তেজিত। ঘটনাটি হলো 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড'। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে রাওলাট আইনের প্রতিবাদ জানাতে একটি জনসভার আয়োজন হয়েছিল। ইংরেজ সেনাপতি ও'ডায়ারের নির্দেশে ঐ সভায় অসহায় জনসাধারণের উপর নির্মমভাবে

গুলি চালানো হয়। এর ফলে বেশ কয়েক হাজার নর-নারী-শিশু হতাহত হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কথা ভেবে বাংলার বিপ্লবীরা স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাঁরা জ্বলে উঠলেন। ভাবতে লাগলেন, কিভাবে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। উপদেশ-অনুনয়ে কোনো ফল হবে না ভেবে 'মাস্টার-দা' সূর্য সেন অস্ত্রপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই এর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবলেন। ইংরেজের নির্মম কাজের এই হবে উচিত জবাব।

সূর্য সেনের মধুর আচরণ ও নেতৃত্বের শক্তিতে আকৃষ্ট হলেন অনেক তরুণ। দলে দলে তরুণরা এসে সূর্য সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত—এঁদের মতো তরুণ-তরুণীরা এসে একত্র হলেন সূর্য সেনের পরিকল্পিত পথ ধরে এগোতে।

পরিকল্পনা নেওয়া হলো সশস্ত্র সংগ্রামের। এর জন্যে চাই অর্থ—প্রচুর অর্থ। এই অর্থ সংগ্রহের জন্যে সূর্য সেন তরুণ বিপ্লবীদের নির্দেশ দিলেন সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের। সেই অনুসারে প্রস্তুতিও নেওয়া হলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রেল কোম্পানীর একটি গাড়ীতে করে অনেক টাকা আসবে। সেই টাকা লুঠ করতে হবে।

১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম শহর থেকে জাহাজঘাটায় যাবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন চারজন যুবক। নেহাতই কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন এরা, এমনই ভাব। যেন গভীর ভয়ঙ্কর কোনো উদ্দেশ্য নেই এই দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে। কিন্তু যেই সেই রেল কোম্পানীর গাড়িটি এসে পৌঁছালো, অমনি তাঁরা সক্রিয় ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁদের ভিতরে লুকিয়ে-রাখা আগুনটা যেন বেরিয়ে এলো দুরন্ত উচ্ছ্বাসে। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাড়িটির উপর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ওঁরা পালিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে আর ওঁদের নাগাল পেলো না। ওঁরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ওঁদের প্রিয় নেতা 'মাস্টার-দা'র কাছে।

'মাস্টার-দা' তখন শহরে নেই। তিনি আছেন শহর থেকে অনেক দূরে একটি গ্রামে। তাঁর সঙ্গে আছেন সেই চারজন বিপ্লবী তরুণ, যাঁরা রেল কোম্পানীর গাড়ি থেকে টাকা লুঠ করে পালিয়ে এসেছেন। তাঁদের লুঠ-করা দু' হাজার টাকাও তখন তাঁদের কাছে রয়েছে।

এদিকে পুলিশ 'মাস্টার-দা' আর তাঁর সঙ্গীদের গোপন আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে গেছে। পুলিশ গ্রামবাসীদের মধ্যে রটিয়েছে যে, সূর্য সেন ডাকাত। গ্রামবাসীরা তাই ডাকাত ধরবার জন্যে পুলিশকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। পুলিশ আসার খবর আগেই জানতে পেরেছেন সূর্য সেন আর তাঁর সঙ্গীরা। কিন্তু গ্রামবাসীরা যেখানে পুলিশকে সাহায্য করছে, সেখানে পালানো বড়ো সহজ নয়। নতুন কোনো কৌশল অবলম্বন না করলে ধরা তাঁদের পড়তেই হবে। 'মাস্টার-দা' তাই একটা অদ্ভুত কৌশল প্রয়োগ করলেন।

'মাস্টার-দা' তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছেন। গ্রামবাসীরাও তাঁদের পিছু পিছু

ধেয়ে আসছে, সঙ্গে রয়েছে পুলিশবাহিনী। আর উপায় নেই-ধরা পড়লো বলে। ঠিক সেই সময় মাস্টার-দা ধেয়ে-আসা গ্রামবাসীদের দিকে টাকাগুলো ছুঁড়ে দিলেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। টাকা দেখে গ্রামের গরীব মানুষগুলো হুড়মুড় করে কুড়োতে লেগে গেলো। সেই সুযোগে 'মাস্টার-দা' আর তাঁর সঙ্গীরা পালিয়ে গেলেন। পুলিশ তাঁদের আর খুঁজেই পেলো না।

সেবারকার মতো ধরা পড়লেন না 'মাস্টার-দা' এবং তাঁর সঙ্গীদের কেউ। কিন্তু পুরোপুরি সফলও তো হতে পারলেন না। তাই ঠিক করলেন, এবার আর কোনো এলোমেলো পরিকল্পনা নয়, একটা নিটোল পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে হবে। সে কাজ হবে আরও বড় কাজ। চরম আঘাত হানতে হবে ইংরেজদের উপর। তার জন্যে তৈরিও হতে লাগলেন 'মাস্টার-দা'। তাঁর অনুগামী বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে তুললেন যুদ্ধবিদ্যায় কিছুটা শিক্ষিত একটি সংগ্রামী দল। দলটির নাম দিলেন—'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। এই দল নিয়েই 'মাস্টার-দা' চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করবেন বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

মাত্র ৬৪ জন বিপ্লবীকে বেছে নিয়ে মাস্টার-দা তৈরি হলেন মহাসংগ্রামের জন্যে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের রাত প্রায় দশটা। চট্টগ্রামের বুকে ঐতিহাসিক যুববিদ্রোহের এক আগুন-ঝরানো অবিস্মরণীয় রাত। এই রাতেই 'মাস্টার-দা' বিপ্লবীদের দুটি দলকে পাঠালেন চট্টগ্রাম শহরের দুদিকের রেললাইন নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে। এর ফলে বাইরে থেকে সরকারী সৈন্য আসাটা তত তাড়াতাড়ি হবে না। অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি ছোট দল চট্টগ্রামের টেলিগ্রাম ও টেলিফোন অফিস ছারখার করে দিলেন। গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিং অন্য একটি দল নিয়ে পুলিশ-লাইন ও পুলিশ-লাইনের অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন। লোকনাথ বল আর নির্মল সেন অন্য একটি দল নিয়ে সরকারী অর্থাৎ অকজিলিয়ারী ফোর্সের হেড কোয়ার্টার দখল করে নিলেন। পুলিশ-লাইনে যে-ব্রিটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক্' উড়ছিল তা নামিয়ে পুড়িয়ে দিলেন বিপ্লবীরা। আর সেই জায়গায় বিউগিল বাজিয়ে, বন্দুকের আওয়াজ তুলে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে উড়িয়ে দিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা। সেই সঙ্গে সূর্য সেনকে সভাপতি করে একটি অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও সেখানে করা হলো। এরপর পুরো দুদিন চট্টগ্রাম স্বাধীন হয়ে রইলো।

দুদিন অপেক্ষা করে সমস্ত দেখে-শুনে বুঝে নিলো পুলিশ। তারপর বিপ্লবীদের কবল থেকে চট্টগ্রামকে মুক্ত করে দখল নিতে এলো। পুলিশ এর মধ্যে জেনেছে, বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশ তাই ঘিরে ফেললো বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থানটিকে। ঠিক সেই সময় নির্ভীক বিপ্লবীরা লোকনাথ বলের নেতৃত্বে দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে অটুট সংকল্প নিয়ে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই সংগ্রামের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হলো ইংরেজ পুলিশবাহিনী।

সংগ্রামের প্রথম ধাপে বিপ্লবীরা এগিয়ে থাকলেও সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে একইভাবে শেষ

পর্যন্ত লড়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না। ইংরেজবাহিনী অস্ত্রবলে, লোকবলে এবং সামরিক শিক্ষায় অনেক সমৃদ্ধ। শুধু দেশপ্রেম আর মনোবলকে সম্বল করে একটা বিপ্লবীদল সুশিক্ষিত সুগঠিত ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে আর কতদূর পেরে উঠবে? ব্রিটিশবাহিনী আঘাতের পর আঘাতে বিপর্যস্ত করে তুললো বিপ্লবীদলকে। তবু সংগ্রামের পথ থেকে তাঁরা সরে গেলেন না। যুদ্ধ করতে করতে তাঁদের অনেকেই প্রাণ দিলেন। বিপ্লবীদের তাজা রক্তে লাল হয়ে গেলো জালালাবাদ পাহাড়। বিপ্লবীদের মধ্যে তখনও যারা জীবিত ছিলেন, তাঁদের নিয়ে সূর্য সেন ও অনন্ত সিং পালাতে বাধ্য হলেন।

লোকনাথ বল কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়লেন চন্দননগরে। কিন্তু তিন বছরের চেষ্টাতেও পুলিশ ধরতে পারল না সূর্য সেনকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁর মাথার দাম হিসেবে দশ হাজার টাকা ঘোষণা করলো। তাতেও কাজ হলো না—ধরতে পারলো না সূর্য সেনকে।

বিপ্লবীদের কাছে তখন প্রতিটি মুহূর্তই আশঙ্কার, সংকটের। এর মধ্যেও সূর্যসেন আর তাঁর অনুগামীরা হাত গুটিয়ে বসে না থেকে সুযোগ পেলেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির উপর আক্রমণ হানতে লাগলেন। সরকারকে বিব্রত করতে লাগলেন। সূর্য সেনের সুযোগ্যা শিষ্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কয়েকজন কিশোর অনুগামীকে নিয়ে ১৯৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময় আহত হলেন প্রীতিলতা। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা দিলেন না। বেছে নিলেন আত্মহত্যার পথ।

এবার কিন্তু পুলিশ সূর্য সেনকে ধরবার জন্যে আরও মরীয়া হয়ে উঠলো। আর ঠিক সেই সময় একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসী দশ হাজার টাকার লোভে বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেনকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিলো। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশের বহুদিনের চেষ্টা অবশেষে সফল হলো। ধরা পড়লেন 'মাস্টার-দা' সূর্য সেন।

বিচার হলো। বিচারে সূর্য সেন আর তাঁর অনুগামী তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হলো। সূর্য সেনের অন্যতম প্রিয় শিষ্যা কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হলো।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেন সূর্য সেন। ইংরেজ সরকার তাঁর মরদেহ দেশবাসীর হাতে তুলে দেবার সাহস দেখাতে পারেনি। আর সেই মরদেহের পরিণতি কী হয়েছিল, তাও দেশবাসী নিশ্চিতভাবে জানতে পারেনি। তবে শোনা যায়, ফাঁসি দেবার পর সূর্য সেনের মরদেহ বঙ্গোপসাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ সরকার দেশের মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি দেশের বীর সন্তান সূর্য সেনকে। দেশের মানুষের মনে তাঁর গৌরবময় স্মৃতি আজও অম্লান, আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। সূর্য সেন কে? তিনি 'মাস্টার-দা' নামে পরিচিত হয়েছিলেন কেন? তিনি কখন কিভাবে বিপ্লবের কাজে এগিয়ে এলেন?

২। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কবে কিভাবে ঘটেছিল? এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে ছিলেন? বাংলার বিপ্লবীরা এই হত্যাকাণ্ডকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল?

৩। সূর্য সেন রেল ডাকাতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কেন? এই কাজে সহযোগিতার জন্যে কাদের তিনি কিভাবে পেলেন? কাজটি কিভাবে তাঁরা সমাধা করলেন?

৪। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্যে সূর্য সেন যে-দলটি গড়েছিলেন, তার নাম কী? এই কাজে দলটিকে সূর্য সেন কিভাবে পরিচালনা করেছিলেন?

৫। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৬। সূর্য সেনকে ধরবার জন্যে পুলিশের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয় কিভাবে? শেষ পর্যন্ত সূর্য সেন ধরা পড়লেন কিভাবে? বিচারে তাঁর কী শাস্তি হয় এবং তা কবে হয়?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

জন্ম ঃ ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ মৃত্যু ঃ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর দিয়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তপ্ত শ্বাস বয়ে চলেছে। থেকে থেকে ভীম গর্জনে কেঁপে উঠছে সারা অঞ্চল। ভয়ে কুঁকড়ে আছে সবাই। এই বুঝি বোমা পড়ে!

ঠিক সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুগামী সৈনিকরা তাদের প্রিয় অধিনায়ককে অবিলম্বে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বললো। তারা নেতাজীকে বোঝালো, শত সৈনিক মরলে কোটি সৈনিক জন্ম নেবে, কিন্তু নেতাজীর মতো নেতাকে হারালে তাঁর স্থান সহজে পূর্ণ হবে না।

এসব সতর্কবাণীতে, উৎকণ্ঠার কথায় নেতাজী কিন্তু মোটেই বিচলিত নন। অম্লান হেসে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি জানালেন, তাঁর জীবন নিতে পারে এমন বোমা পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত তৈরী হয়নি।

১৮৯৭ সাল ২৩শে জানুয়ারী পিতার কর্মস্থল কটক শহরে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জানকীনাথ বসু, মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রাম হলো সুভাষচন্দ্রদের আদিনিবাস। সারা দেশের মতোই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সেই গ্রামের আজ কত গৌরব! সেই গৌরব প্রকাশ করবার জন্যেই আজ সেই গ্রাম 'সুভাষগ্রাম' নামে পরিচয় লাভ করেছে।

কটকের এক সাহেবী স্কুলে সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনা শুরু হয়। কিন্তু সেখানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের ও শিক্ষকদের ব্যবহার তাঁর পছন্দ হয়নি। সেইজন্যে পরে তিনি কটকেরই র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। তিনি সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে স্বদেশী ভাবনায় ভাবিত হতে অনুপ্রাণিত করেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্র তখন কটকের বহু জনহিতকর কাজেও যোগ দেন। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত কটকে থেকে সুভাষচন্দ্র পড়াশুনা করেন। কটকের র‍্যাভেনশ স্কুল থেকেই তিনি ১৯১৩ সাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর কলকাতায় এসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ভারতের রাজনীতিতে তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তুমুল হয়ে উঠেছে। ঐ সময়েই প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ওটেন ক্লাসে এসে একদিন ভারতবাসীর পক্ষে চরম অপমানকর কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক ওটেনের এই সব কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এর ফলে কলেজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অন্য কলেজে ভর্তি হওয়ার পথেও বাধার সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি, এ, পাশ করেন ১৯১৯ সাল। ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে এম, এ, পড়তে পড়তে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ে জীবনের এক নতুন দিগন্তের আভাস পেলেন। এই সমস্ত বইয়ে লেখা সব কথা মেনে নিতে না পারলেও স্বদেশপ্রেমের মহিমায় তিনি নতুন করে অনুপ্রাণিত হলেন।

১৯২০ সাল জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরবার আগে তিনি কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপস্ লাভ করেন। ততদিনে দেশে শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা আর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা সুভাষচন্দ্রকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করলো। আই-সি-এস পাশ করেও তিনি ইংরেজের গোলামী করতে চাইলেন না। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মনের কথা তিনি একটি চিঠিতে জানালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। বাংলার তরুণসমাজের উপর তখন দেশবন্ধুর সীমাহীন প্রভাব। দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে স্বদেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিদেশী সরকারের চাকরী প্রত্যাখ্যান করে জ্বলন্ত দেশপ্রেম হৃদয়ে বরণ করে তিনি স্বদেশ জননীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করলেন। এইভাবেই শুরু হলো তাঁর পুরোপুরি রাজনৈতিক জীবন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে একে একে পেলেন কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদকের পদ এবং জাতীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষের পদ। এর পরেই ইংরেজ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয় ১৯২১ সালে। ১৯২২ সালেই মুক্তি পেয়ে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হন। ১৯২৩ সালে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজার ও সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ঐ বছরেই কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের ২৩শে এপ্রিল সকলের সমর্থনে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ লাভ করেন এবং এর সাহায্যে দেশের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। সুভাষচন্দ্রের এই সমস্ত কাজ ইংরেজ সরকারের ভালো লাগছিল না বলেই হয়তো ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। প্রথম কিছুকাল তাঁকে কলকাতায় রেখে পরে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়।

তারপর শেষে তাঁকে পাঠানো হয় মান্দালয় জেলে। সেখানে নানা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে অনশন-সত্যাগ্রহ করার ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি ঘটে। এই কারণেই তিনি ১৯২৭ সালের ১৬ই মে জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পাবার পরেই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবকদের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়েই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পদে মনোনীত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। এরপর এইভাবেই নানা অজুহাতে ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

১৯৩০ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ছাড়া পেয়ে আবার কিছুদিন পরেই তাঁকে জেলে যেতে হল। এইরকমই চলতে লাগলো বারবার। দীর্ঘদিন কারাবাসের ফলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভীষণ ভেঙ্গে পড়লো। তখন তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে বলেও সন্দেহ দেখা দিলো। ভারত সরকার তাই তাঁকে ১৯৩৩ সালে ভিয়েনায় পাঠালো চিকিৎসার জন্যে।

ভিয়েনায় সুভাষচন্দ্রের চিকিৎসা চলছে। এর মধ্যেই খবর পাওয়া গেল তাঁর পিতা জানকীনাথ গুরুতর অসুস্থ। এই খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র রাজবন্দী অবস্থাতেই দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে আসার আগেই অবশ্য জানকীনাথ মৃত্যুবরণ করেন। তাই দেশে আসার কিছুদিন পরেই আবার সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্যে ভিয়েনায় ফিরে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি চুপচাপ বসে থাকলেন না। দেশের মুক্তির জন্যে নানা কাজে তিনি ব্যস্ত রইলেন। এই কাজের টানেই সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে গেলেন আয়ারল্যাণ্ডে। সরকারের আদেশ অমান্য করে এরপর তিনি ফিরে এলেন দেশে। এর ফলে দেশে ফিরতেই তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে যেতে হয়। সুভাষচন্দ্রের এই কারাবরণ দেশ জুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সমস্ত দেশ বিনাশর্তে তাঁর মুক্তির দাবিতে চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠল। ইংরেজ সরকার তখন তাঁকে বিনা শর্তেই মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

সুভাষচন্দ্র যখন চিকিৎসার জন্যে ভিয়েনায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় থেকেই মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ দেখা দেয়। এর মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে পরপর দুবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পরেই গান্ধীপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ চরমে পৌঁছায়। এর ফলে স্বাধীনচেতা সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারপর গড়ে তোলেন একটি নতুন দল। সেই দলের নাম হল 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। এই দল গঠন করে সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বপ্নকে, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন।

সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, এভাবে কোনো কাজ হবে না। ব্রিটিশ রাজশক্তির শক্ত ভিতকে কাঁপিয়ে দিতে হলে চাই বিদেশী শক্তির সাহায্য। কিন্তু উপায়-বা কী? অসংখ্য গুপ্তচর তাঁর উপর দৃষ্টি রাখছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যে খুবই কঠিন।

শেষ পর্যন্ত সেই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গোয়েন্দাদের অতি সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে মৌলবীর ছদ্মবেশে তিনি পালিয়ে বিদেশে চলে যান। প্রথমে পেশোয়ারে গিয়ে সেখান থেকে তিনি কাবুল হয়ে যান রাশিয়ায়। তারপর রাশিয়া থেকে জার্মানীতে গিয়ে কিছুদিন বার্লিনে থাকেন।

১৯৪২ সালে বার্লিন বেতার থেকে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন—'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশ ছিল ব্রিটিশের বিপক্ষে। তাই তাদের সাহায্য গ্রহণের জন্যে সুভাষচন্দ্র সচেষ্ট হলেন। ঐ সময়ে আর এক বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন জাপানের টোকিও শহরে। তিনিও ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত হানবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জাপানের হাতে বন্দী হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে তিনি একত্র করেছেন। এই সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবার জন্যে তিনি সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানান। সুভাষচন্দ্র তাতে সাড়া দিয়ে টোকিওতে পৌঁছান। সেখানে রাসবিহারী বসুর পরামর্শে এবং জাপানের তখনকার প্রধানমন্ত্রী তোজোর সহায়তায় ভারতের প্রথম জাতীয় সৈন্যদল গঠন করেন। এই সেনাবাহিনীর নাম হল—'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। এই সেনাবাহিনী সুভাষচন্দ্রকে তাদের পরম প্রিয় নেতা বলে বরণ করে নিলো। তাদের কাছে সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলেন 'নেতাজী'। সেই নেতাজীই এই সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন—'দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ'।

তারপর এলো ১৯৭৩ সাল। নেতাজীর সেনাবাহিনী 'জয় হিন্দ' ধ্বনিতে মুখর করে তুললো চারদিক। এগিয়ে চললো দুর্জয় অভিযানে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে এই সেনাবাহিনী দখল করলো ভারতের পূর্ব সীমান্তের মোওডক ঘাঁটি। ভারতের মাটিতে প্রথম উড়লো ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। এই সেনাবাহিনীর আর একটি অংশ জাপানীদের সাহায্যে কোহিমা দখলে এনে এগিয়ে যায় মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের দিকে। আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী তখন দেশপ্রেমের উত্তাপে উত্তপ্ত। সেই উত্তাপ তাদের করে তুলেছে সিংহের মতো বিক্রমসম্পন্ন। এদের সিংহবিক্রম কাঁপিয়ে দিলো ব্রিটিশসিংহকে। 'জয় হিন্দ' ধ্বনি আর 'দিল্লি চলো' আহ্বানে কেঁপে উঠলো আকাশ-বাতাস। এই মুহূর্তেই নেতাজীর সেনাবাহিনীর দুরন্ত অভিযানের পথে তাদের দখলে এলো আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও। এর পর নেতাজী এলেন আন্দামানে। দ্বীপটির নাম রাখলেন 'শহীদ দ্বীপ'।

শেষ পর্যন্ত নেতাজীর সেনাবাহিনী এই বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখতে পারলো না। বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটায় আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। নেতাজী তখন রেঙ্গুন থেকে কোনো অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে বিমানে করে রওনা হলেন। এরপর যে কী ঘটেছিল, তা আজও গভীর রহস্যে আবৃত। ১৯৪৫ সালে প্রচার করা হলো জাপানের তাইহোকুতে একটি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে!

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। হয়তো তাই, কিংবা তা নয়। অগণিত মানুষ এই বিতর্কে যেতে চান না। তাঁরা জানেন, তাঁদের পরম প্রিয় 'নেতাজী' আজও বেঁচে আছেন এবং চিরদিন বেঁচে থাকবেন তাঁদের মনের মণিকোঠায়।

॥ প্রশ্নমালা ॥

১। কবে কোথায় সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন? সুভাষচন্দ্রের পিতা ও মাতার নাম কী? সুভাষচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল কোথায়? এই আদিনিবাসটি বর্তমানে কী নামে পরিচিত?

২। সুভাষচন্দ্র কোথায় পড়াশুনা শুরু করেন এবং কতদিন পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনা করেন? এই সময় তিনি কিভাবে স্বদেশী ভাবনায় ভাবিত হন?

৩। সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে কখন ভর্তি হন? পরে তাঁকে কেন এই কলেজ ছাড়তে হয়? অন্য কোন্ কলেজে তিনি কিভাবে ভর্তি হন?

৪। সুভাষচন্দ্র কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন? এই রাজনৈতিক জীবনে তিনি কিভাবে নানা ভূমিকা পালন করেন?

৫। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয়েছিল কেন? কংগ্রেস ত্যাগ করে তিনি কোন দল গঠন করেন। এই দল গঠন করে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন?

৬। সুভাষচন্দ্র বিদেশী শক্তির সাহায্যকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন কেন? এই সাহায্য গ্রহণের জন্যে তিনি কী করেছিলেন? প্রধানতঃ কার কার কিরূপ সাহায্য এই সময় তাঁর কর্মধারা সচল রেখেছিল?

৭। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' কিভাবে গঠিত হয়? এই সেনাবাহিনীর অভিযানের বর্ণনা দাও?

———